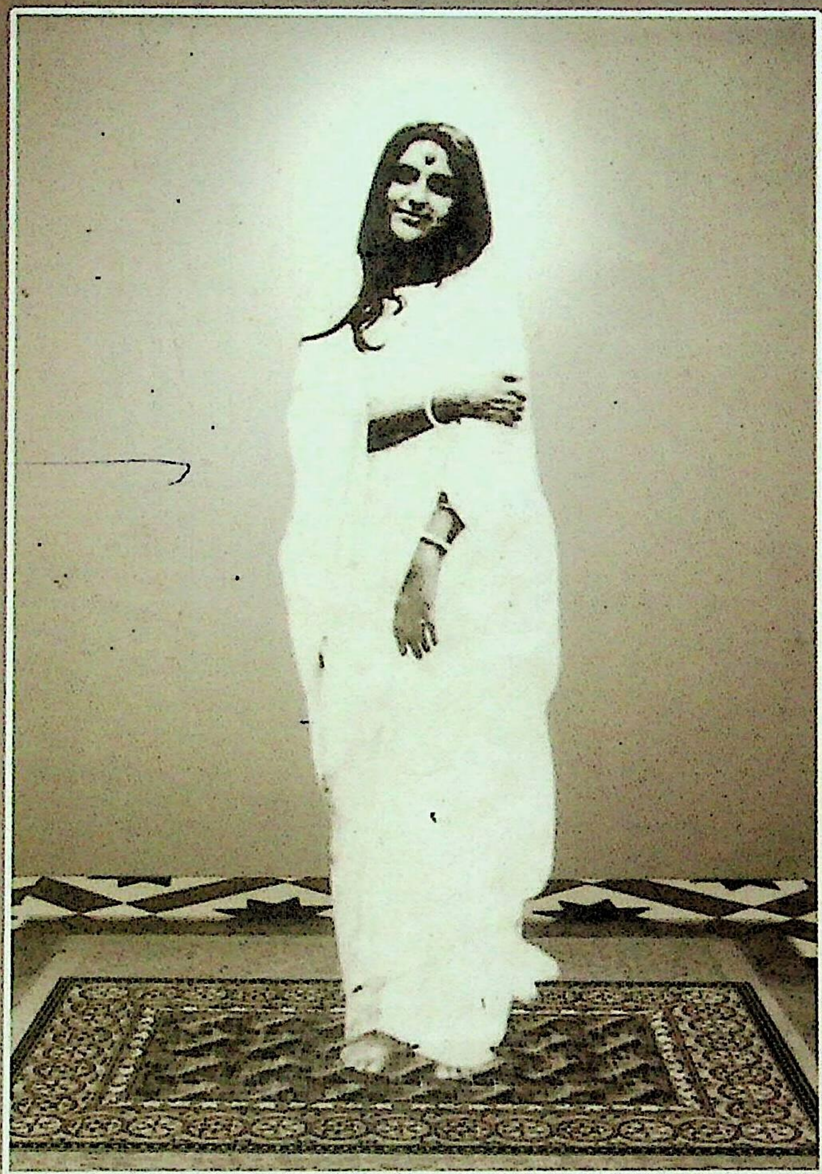
ধায় তব বাণী অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে



Rs. 50/-



উৎসর্গ

তোমারে নহি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নহি হে সকল জীবন কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তি পাবন তোমার পূজার ধূপে
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিণু আজি এ অরুণ কিরণরূপে।
মাগো তোমার অমৃত বাণী
কিছু সংগ্রহ করে
তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিলাম।
তোমার অধম কন্যা।

প্রথম প্রকাশ:

গুরু পূর্ণিমা, ১৪১১ বঙ্গাব্দে
১৯শে জুন, ২০০৪

প্রাপ্তিস্থান:

শ্রীমা
৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড
কলকাতা - ৭০০০২৬

Rs. 5/-

মা কি বলেন

"হরি কথাই কথা
আর সব বৃথা ব্যথা"

—শ্রীশ্রীমা

পঞ্চ মহান বার্তা

১। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।

২। যতক্ষণ আমি ততক্ষণ তিনি নাই। আমার মৃত্যু তাঁর প্রকাশ।

৩। অমর আত্মা অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি।

৪। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।

৫। সর্ব ধর্মই একধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের চিঠি

(ভাইজী-মাতৃদর্শন, পৃঃ ১১৭)

৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৭

হে পরম পুরুষ! জগৎ পতি পত্নী। পিতা
মাতা সন্তান এবং সর্ব্ব ভাবে স্থিত;
দেখিতেছি যায় যেন হে অনন্ত..
হওয়ায় দুই বার কোন ও কথন নাই।
বিশুদ্ধ ভক্ত অটল বিশ্বাস ও -
আকুল পিপাসা নিয়া চলিতে যায়,
তের স্বরূপ অবশ্য দেখিতে পাইবে।

শ্রীনির্ম্মলা সুন্দরী দেবী

শ্রীশ্রীমায়ের হস্তাক্ষর

তাঁহার একটুখানি হস্তলিপির জন্য অনেক প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলেন—"আমি তো ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না, যদি সময় হয় পাইবি।"

সৌভাগ্য বশতঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৪টা আষাঢ় যে লিপি করেন তাহা এখানে সন্নিবেশিত হইল।

দিব্য স্তোত্র

যখন এই শরীরটা হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইত তাহা যে কত ছন্দে তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। সবই অনন্ত, কত বলিব। একে একে স্তোত্র না কি বল তোমরা বাহির হইতে লাগিল, ছন্দের পর ছন্দ বাহির হইয়া যেন আবার ছন্দেই মিলাইয়া গেল। সুর, তালই বা কতরকমের। সব গিয়া একে একে যেন, সুর সেই মহাসুরে, শব্দ সেই মহাশব্দে মিলাইয়া যাইত।

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত দিব্য ভাষার স্তোত্র—

১

এহি ভাবনায়ং ভায়ং
এহি যং সং তানি তায়ং

বাং ক্রীং আং হে
তাং হাং হীং হৌং হং
হিং বং লং যং সং ত্বম্
তাদরৌ ভাগ সং বং লং হেং
দেব ভক্তময়ং মম হে
সত্বং হি হং যং বং বায়ং কং
ভাবভক্তি...ভাবময়ং হে
মহাত্মায়াং ভবভয় হর হে

২

ভাবময়ং ভবভয় হরণং হে
যস্মিং স্বহং ভাগ পৌংহং

যস্তারণং তত্র দ্বয় রূপং
মহাহি সর্ব্বাণি স্বরূপময়ানি
ময়াহি সর্ব্বঃ
ময়াহি সর্ব্ব শরণং হে।
দাস নিত্য-প্রণবশ্রুত কারণং
মহামায়া ময়া ভাবময় ময় হে।
মম ভো ভক্তৌ তরণং মা
মম সর্ব্বময়ং হে

৩

দৈবতং ময়ং মে সা তং হ্রীং
মত্তস্ত্বম্ ভবোহয়ং
যস্তানি ত্বাং তারণময়ং
ভবময় নাশং ভাবয় হে।
স্বভাব শরণাগতং প্রণবজাসনম্।
ভবাণীভবং ভবভয়নাশনং হে

৪

যস্যং রুদ্র রুদ্রত্বং
প্রণবে রাং ঋং কৃতকারণং
রুদ্রং নৌমি।
প্রাং বাং হাং সাং
আং হীং অং
ভাবময়ং হে...

হর শরণাগতং...তায়ং সংসৃষ্ট কেশবঃ
বিভাবতঃ মমায়নং হে।

(পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ রামঠাকুর মহাশয় ইহার অর্থ করিয়া দিয়াছেন)

স্তোত্রটির মর্ম্মানুবাদ—

তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিখিল ভাবনায়ক, তুমি আবির্ভূত হও। তোমা হইতে অবিরত সৃষ্টিজাল বিস্তীর্ণ হইতেছে। তুমি ভবভয়হারী, তুমি আবির্ভূত হও। তুমি অখিল বীজস্বরূপ, এবং তুমিই সেইজন যাহাতে আমি অবস্থান করিতেছি। এই যে আমাদের ভক্তগণ, তাহাদের মধ্যেও তুমি বিরাজ করিতেছ। এই যে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই তুমি ভবভয় হরণ কর। হে সর্ব্বদবময়, আমা হইতেই তুমি এবং অমিই বিশ্বজগৎ। যে তারণময় এতৎ সমস্তের অধিষ্ঠানভূমি সেই ভবভয় নাশকারীকে ভাবনা কর। তুমি নিত্য স্ব-স্বভাব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। প্রণবজ অর্থাৎ বেদ সমূহের তুমিই প্রতিষ্ঠাভূমি। তুমিই সমরসীভূত নাদবিন্দাত্মক কাম কামেশ্বরীরূপ দিব্যমিথুন, তুমি ভবভয় নাশ কর। আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার আশ্রয়, তুমি আমাকে তোমাতে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি যখন তারক—তখন তোমার দ্বিবিধরূপ—মোক্ষদাতা ও মুমুক্ষুজীব। আমাদ্বারাই সকলে স্বরূপময়। আমার দ্বারাই সকল, আমাতেই সকল ভূতগণের প্রতিষ্ঠাভূমি। আমিই সেই প্রণবপোদিষ্ট কারণ, আমিই একাধারে মহামায়া এবং মহাভাবময়। আমাতে যে ভক্তি তাহাই মোক্ষের হেতু। সকলই আমার যে আমা হইতে রুদ্রের রুদ্রত্ব, সেই আমি কার্য্যকারণাত্মক, রুদ্রকে স্তুতি করি।

(মাতৃদর্শন, পৃঃ ৪৮)

মাতৃবাণী

"আমরা ভগবৎ প্রাপ্তির পথ ধরিব কি করিয়া?" কাহারো এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখে আমরা শুনিয়াছি—"যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় এইরূপেও করিতে পার। সর্ব্বদা এই সব দিকগুলি হওয়া প্রয়োজন। যদি সময়াভাব বল তবুও যতটা সম্ভব করাই, আর অবসর সময়ে কি ছুটির দিনে পূর্ণাঙ্গীণ চেষ্টা।"

এক	সৎক্রিয়া—সৎসঙ্গ
দুই	সত্য কথা বলা
তিন	তৎজ্ঞানে সেবা—জন-জনার্দ্দন
চার	সদগ্রন্থ পাঠ
পাঁচ	কীর্ত্তন
ছয়	ক্রিয়া যোগ
সাত	পূজা
আট	জপ
নয়	ভগবৎ কৃপা প্রার্থনা
দশ	স্মরণ
এগার	শরণাগতি
বার	তৎ ধ্যান

তুমি মাটির মতন নিবেদিত হোলে তবে তোমার বুকে ফুটবে ফুল, ফুল ফুটবে মাটির বুকে চরণ পড়বে তাঁর।

* * *

"এই শরীরটায় কোন সংকল্প নেই। কোন বন্ধনও নেই। উড়া পাখী ঢুকে যায় তোমাদের আশ্রমে, বেরিয়ে যায় আবার।

* * *

"গুরু কে? না—পিতা, মাতা এবং যাহার নিকট হইতেই আমরা গুরু বিষয়ে একটু জানিতে পারি তিনিই গুরু। যিনি রাস্তার খবর একটুও দেন তিনিই গুরু"।

"তোমার গুরু যিনি, জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি, তোমার গুরু তিনি। যেখানে গেলে নিজের গুরুর উপর অশ্রদ্ধা জন্মায় সেখানে যাইও না"।

* * *

"কৃপা তিন রকমের। গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা ও আত্মকৃপা। গুরুতো সবসময়ই তার শিষ্যকে কৃপা করছেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ও শিষ্যের মঙ্গল কামনা করছেন। ঈশ্বরকৃপা লাভও সহজ। ঈশ্বর পরম পতি, পরম করুণাময়।

* * *

'গুরু-আদেশ নির্বিচারে পালনই সবচেয়ে বড় সেবা। তুমি যেখানে আছো সেই স্থিতি হতেই কখনও গুরু নিজেই আদেশ পালনের ব্যবস্থা করে দেন। চেষ্টা করলে আদেশ পালনের শক্তি প্রকট হতে পারে। আদেশের উপর পূর্ণ নিষ্ঠা থাকা উচিত।"

* * *

নির্বিচারে গুরু নিষ্ঠা খুব ভাল। তাতেই লক্ষ্যে পৌছান যায়।

* * *

যে বাস্তবিক গুরুকে শ্রদ্ধা করে সে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে না।

* * *

বাহিরের পুস্তক পড়িলে যেমন বাহিরের বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায়, মূর্খ শিশুও পণ্ডিত, বিদ্বান হইয়া ওঠে, তেমনি সকলের ভিতরই একখানা করিয়া বই আছে তাহা পড়িবার চেষ্টা কর, তাহা পড়িলেই আর কোন বিষয়ে সংশয় আসিবে না। প্রশ্ন থাকিবে না, এখন যে বিষয় প্রশ্ন করিতেছ, এই বিষয় তখন নিজেই বুঝিতে পারিবে।

* * *

এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি—এই দর্শন কি রূপ? মাঃ আত্মদর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন মানে কি? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন—এই তিন যেখানে, সেখানে ব্রাহ্মী স্থিতি হয়। যেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নাই তাহাই আত্মস্থিতি। আর যদি রূপদৃষ্টিতে দেখ তবে সর্বত্র। যেমন বলে না, 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফূরে।'

* * *

তোমরা যে যে দ্রব্য নিয়ে আরতি করো, সেইগুলি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীকরূপ। যেমন দীপ অর্থাৎ দৃষ্টি, এ শরীরের দৃষ্টি দিয়েই আরতি করা হোত। আবার ধূপ অর্থাৎ গন্ধ শঙ্খের জল, কাপড় অর্থাৎ আবরণ, চামর অর্থাৎ বায়ু, এই সব দিয়ে আরতি হয়ে যেতো। আর আরতির শেষে যে শঙ্খধ্বনি হয় তাতে নিজেকে আহুতি দিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

* * *

এবার ঠিক হয়েছে। এতক্ষণ একটু গোছগোছ ঠিক রেখে গান (কীর্তন) হচ্ছিল। এখন ঝড় ওঠায় গ্রন্থি খুলিয়া গেল। ঝড় না উঠিলে কি গ্রন্থি খোলে।

* * *

জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করা দরকার। ভোরবেলা জাগরণের পর হ'তে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবটি রাখতে চেষ্টা করা। এইরূপ করতে করতে ক্রমশঃ মনে আসবে যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ জিনিষ তাঁকে কি করে দেব? তিনি যে আমার কত প্রিয়—আপন জন। প্রিয়জনকে কি খারাপ জিনিষ দেওয়া যায়? এই ভাবতে ভাবতে আর খারাপ কাজ করাই চলবে না। তারপর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চরণে উজাড় করে দিলে, নিজের বলে আর

কিছুই রইল না, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার অল্পত্ব পূর্ণ করে দেন। আর তখন চাইবার পাইবার কিছুই বাকী থাকে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার এই সমর্পণ, সেই মুহূর্ত্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তার প্রকাশ।

* * *

এই শরীরের কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই, এমনকি যারা মনে করছে তাদেরও।

* * *

দেখ আমরা একের মধ্যে আছি। এক পা এক পা করিয়া হাটিতে হয়, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাইতে হয়, এক একটি করিয়া অক্ষর লিখিতে হয়।

* * *

পরমার্থ পথে আলস্য লালসা এই দুটি মহাবিঘ্ন, ধৈর্য্য, তিতিক্ষাই অনুকূল।

* * *

দেখ "ঋষি" আমি ত বলি, যিনি তাঁহার রসে রসবান, তিনিই ঋষি। আর মুনি, যাঁহার মন তাঁহাতে লয় হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, আমি ত বলি তিনিই "মুনি"।

* * *

জ্ঞানে আর সংশয়—সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। সংসার থাকে না যেখানে দেহও থাকে না সেখানে। .... কে বলিল দেহ থাকে? নাম রূপেরই কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর দৃষ্টি আছে বা নাই তারও প্রশ্ন নাই। 'দেও' 'দেও' আর কার কাছে তাঁর? 'দেও' 'দেও' এই ভাবটাই ত দেহ। যে হেতু সংসার নাই, দেহ নাই, সেই হেতু এই কর্ম্মও নাই, অর্থাৎ দেহ, সংসার, কর্ম্মের প্রশ্নই নাই—একেবারে ধোয়া-মোছা, নাই ও নাই, কথা বলা ও যা না বলাও তা চুপ করে সেখানে, চুপ না করেও সেখানে—যা' তা।"

* * *

তোমাকে চিন্তা করিলে তুমি কি আমাদের দেখিতে পাও?

"হ্যাঁ, টর্চের আলো ফেললে জিনিষগুলি যেভাবে ফুটিয়া উঠে, তোমরা যখন এ শরীরের কথা চিন্তা করো, তখন তোমাদের মূর্তি এ শরীরের মধ্যে সেইভাবে ফুটিয়া উঠে।"

* * *

মা, জীবন মুক্তদের কি স্বপ্ন হয়?

"মা যাহারা চিরজাগ্রত তাহাদের স্বপ্ন কি করিয়া হইবে। আর স্বপ্ন যদি বল এই যে আমরা সব দেখিতেছি সবই তো স্বপ্ন।"

* * *

"কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে তো আসা যাওয়া নেই। তখনও যা, এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আর কি কথা?"

* * *

সমাধি কাকে বলে?

"মা, আমি তো বলি বাবা, ভাব ও কর্ম্মের সম্পূর্ণ সমাধানের বা সমাপ্তির নামই সমাধি। জাগতিক হিসাবে বলি তোমরা যেমন সারাদিন কাজ করে খাও, দাও, তারপর গাঢ় নিদ্রা।

* * *

খেজুর গাছ প্রথমে কাটলেই কি আর রস বাহির হয়। কাটিতে কাটিতে তাহা হইতে ঝর-ঝর করিয়া রস বাহির হয়। সেই রসে কত শক্ত জিনিষ তৈয়ার করা হয়। তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলিবে। তোমরা নিয়ম মত কাজ করিয়া যাও।

* * *

দিদিমা বলছেন 'জগন্নাথ' স্পর্শ আর হলো না। মা উত্তরে বল্লেন—"এই শরীরটাকে স্পর্শ করো তাহলেই জগন্নাথ স্পর্শ হবে।

* * *

"সত্য স্বরূপ ভগবানের সঙ্গ মানেই সৎসঙ্গ। যাঁকে আশ্রয় করলে সকল দোষ দূরে যায় তাঁকেই আশ্রয় করা। তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি বন্ধু, তিনি সখা, সব—এই বোধ রাখতে হয়। তিনি কি না দিয়ে পারেন? তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না, তা হতেই পারে না। রাস্তা

লম্বা কি ছোট এই প্রশ্ন মনে স্থান দিতে নাই। আমাকে প্রাপ্ত হতেই হবে এই ভাবনা রাখা। তোমার পূর্ণশক্তি তুমি লাগাও, তবে ত তুমি পাবে। আসা যাওয়া নাই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা যাওয়া হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করতে হয়। কোথায় আসা? কোথায় যাওয়া? যাঁর আশ্রয় নিলে মুক্তি; তিনি স্বয়ং সর্বত্র আছেন।"

* * *

কোটীতে গোটী কেন বলা হয়? মা—ঐ সর্ব প্রকাশ ঐ সর্ব আর ঐ এক প্রকাশ যে ছোঁওয়ায়—

এ শরীর আত্মরূপে সর্বময় ব্যাপ্ত, সকলের মধ্যে স্থিত, বিশ্ব, বিশ্বাতীত সকলের সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ। এ শরীর কারুর নিকট নূতন নয়—"পুরাতন"—পূর্ণতন অর্থাৎ পূর্ণতনু সকলের শরীর মিলে যে এক শরীর সেই মায়ের শরীর অর্থাৎ সকলের সঙ্গে অভিন্ন—এক আত্মা।

* * *

জপ সমর্পণ করতে করতে আস্তে আস্তে প্রকাশ হতে লাগলো—নাম নামী কে? আমি কে? নিজেকে পাওয়াটা কী? এটা যখন প্রকাশ হলো তখন জপে পরিপূর্ণতা এলো। কাজেই জপ করেই যাওয়া। উন্মুখ হয়ে থাকা—যে মুহূর্তে প্রকাশ হবে তোমার যা সব অর্পণ—সব কিছুই ফিরে পাবে।

* * *

ধীরে ধীরে আসে "বহুর মধ্যে একের ভাব, একের ভাবনা।"

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ঘুচে গিয়ে অহংকার নাশ হয়ে গেলে যে অবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় তাই মৌন।

"মন-প্রাণকে এক সঙ্গে এক চিন্তায় ঘনীভূত করে ভিতরে বাহিরে পাথরের মতো হয়ে যা।"

* * *

শরীরকে সুখ দেয়া মানে ভগবদ্‌ভাব হ'তে স'রে থাকা। রসাল খাদ্যে রসনাকে তৃপ্ত করা ভগবদ্-রস হ'তে তফাতে সরে থাকা। তাই যা কিছু খাওয়ার, সময়ে খাওয়া, ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করা।

* * *

ভগবানের অনন্তভাব, অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, আবার তাঁর মিলনের রাস্তাও অনন্ত। কেবল মাত্র তাঁকে পাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যে নিত্য মিলনে রয়েছ, তা জানার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার আশ্রয়ে উন্মুখ হয়ে থাকা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

* * *

ফুলের মধ্যে যেমন বীজ আছে, খুললেই দেখা যায়, আবার বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে। তেমনি তোমার মধ্যেও তিনি আছেন। সাধন করে, মনের আবরণটা নষ্ট করতে পারলে—সেই যে স্বয়ং প্রকাশ—তাঁকে পাওয়া যায়।

* * *

মন চল যাই রজকের ঘাটে
চৈতা ধোপা দিচ্ছে ভাটি, নিতাই গঞ্জের ঘাটে
(মন রে ওরে অবোধ মন)

পাঁচ রমকের সাজিমাটি, পরিপাটি খাটে,
ভাটি বেলায় ভাটি দিলে, ভাটির ফল কি ঘটে?
বেদ চিঠি সব তেলের দাগে, মন বাসনে রটে,
অড়ি জোরে বাড়ি দিল বসন যায় রে ফেটে
(মন চল যাই রজকের ঘাটে)

* * *

এই শরীর ত এক কথা—কাহারো সঙ্গে কথা বলি না, কাহারো কাছে যাই না, কাহারো খাই না।

* * *

শূন্য হয়ে সাদা হওয়া যায়, কিম্বা সকলের ভিতর হারিয়ে গেলেও সাদা হওয়া যায়। সাদা সকল রূপ নিয়ে অরূপ হয়ে আছে, অথবা অরূপের রূপই সাদা। সাদা হতে হলে সিধা থাকতে হয়।

* * *

এক সুর, এক তাল হলেই ভাল হয়। যাঁকে নিয়ে কীর্তন, তাঁকে

স্মরণে রাখিস, নতুবা কেবল বাদ্যোৎসব হবে, নাম কীর্তন নয়।

* * *

বিগ্রহ প্রণাম বা মহাপুরুষ প্রণাম করার সময়ে প্রথম চরণ ধ্যান করা। ধীরে ধীরে প্রণামের সমগ্র শরীর ও মুখমণ্ডল ধারণায় আনা। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয় ও ভাবনা করিতে হয়ে যে আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর শক্তিতে ভরপুর হয়ে আমাকে মহাবলশালী করে দিচ্ছে। দণ্ডবৎ অর্থাৎ দণ্ডের যেমন মাটিতে পড়ে থাকলে নিজের কোন সত্তা থাকে না, দণ্ডবৎ প্রণামেও নিজের সমগ্র সত্তার পূর্ণ সমর্পণ।

সব শক্তিপাত চরণ থেকে হয়। মস্তক তা ধারণ করে। তিনি আমাকে কৃপা করে তাঁকে প্রণাম করবার অধিকার দিয়েছেন। তারপর শ্বাস ফেলতে ভাবা যে তিনি আমার সব অবগুণ গ্রহণ করে নিয়ে, আমাকে পবিত্র করে দিচ্ছেন।

গঙ্গাজলে মাটি ভরতে গেলে প্রথমে আসে গঙ্গাজল দিয়ে লোটা ধুয়ে সেই জল গঙ্গাতেই ফেলে, তেমন তুমিও তার শক্তি গ্রহণ করে নিজের সব অবগুণ তাকে দিয়ে দিচ্ছে। ঘটিতে জল ভরে উপর থেকে— তেমনি মস্তকই শক্তিপাত ধারণ করে।

হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা শক্তিপাত হয় সেজন্য হাত দিয়ে মস্তকে ও পীঠে আশীর্বাদ করা হয়। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে বিদ্যুৎ নির্গত হয় সেজন্য পরিপক্ক ফলসহ বৃক্ষের দিকে আঙ্গুল দেখালে অনেক সময় সেই ফল পড়ে নষ্ট হয়।

মস্তক শক্তিপাত গ্রহণ করে সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে দেয়,— যেমন মূলে জল সেচন করলে সমস্ত বৃক্ষে সেই জল পৌছায়।

* * *

বৃক্ষ যেমন বীজে সমাহিত থাকে, এই প্রকাশময় বিশ্ব সমাহিত থাকে ঈশ্বরের ঈক্ষণে। ঈক্ষণই বীজ, বিন্দুরূপে। তাঁর ক্ষরণই এই বিশ্ব। অক্ষরের ক্ষরণ—যেমন সাগরের বুকে ঢেউ, উহা হইতেই উদয়, উহাতেই লীলাবিলাস, উহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন; তা-ই হইয়া যাওয়া। সৃষ্টি যেন অমল শুভ্র বর্ণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত, আবার সপ্তবর্ণ অনন্ত বর্ণে রঞ্জিত। 'এক'ই লীলায় বহু রূপে, আবার লীলা অন্তে 'একে'ই সমাহিত।

*　　　*　　　*

(সংযম) সবাই মিলে করলে ভাল হয় যদি সপ্তাহে দু'বার করতে পারো। সঙ্কল্প করবে যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে সত্য কথা বলবে, গ্রাম্য কথা ও নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বর্জন করবে, ব্রহ্মচর্য পালন করবে, লোভনীয় খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করবে, মিতাহার করবে; সর্বদা ভগবৎচিন্তায় রত থাকবে, গীতা বা অন্য শাস্ত্র পাঠ করবে, সাধুসন্তের সঙ্গ করবে, যাবতীয় কাজ করবে ভগবৎসেবা-জ্ঞানে, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে, কারও সঙ্গে কলহ করবে না। এইভাবে চলতে চলতে কোন একটি দিনেও যদি তোমার অন্তরতমের অণুমাত্র স্পর্শ অনুভব করো, তখন তাঁর অবিরাম সান্নিধ্যের জন্য তোমার আকাঙক্ষা হবে; তখন বাইরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর ভগবৎচিন্তা জাগ্রত হবে, ধীরে ধীরে ঘটবে তোমার জীবনের রূপান্তর।

*　　　*　　　*

বস্ত্র হরণ মানে নিরাবরণ প্রকাশ, তুমি যে মুক্ত—স্বয়ং + আমি—নিরাবরণ—তারই প্রকাশ।

*　　　*　　　*

সুন্দরভাবে পরিপালিত হল প্রথম সংযম সপ্তাহ। একদিন ধ্যানের সময় সকালে শ্রীশ্রীমা স্বচক্ষে দেখেন যে একটি চার পাঁচ বছরের বালক, মাথায় তাঁর চাঁচর কেশ পরনে মোহন বেশ মার দিকে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে তন্ময় হয়ে গাইছেন—

"হে পিতঃ, হে হিতঃ, হে ব্রহ্ম তত্ত্বম।
হে পিতঃ, হে হিতঃ, হে ব্রহ্ম ভূতম্।
হে পিতঃ, হে হিতঃ, হে ব্রহ্ম স্বরূপম্।।

*　　　*　　　*

"ছোট জীবন বীণাটি এত বিস্তর তারে বাঁধা। কেটে দিলেই হয়। এই বিস্তর তারে বাঁধাতে সার নয়।"

*　　　*　　　*

কৃষ্ণ কানাইয়া বংশী বাজাইয়া গাউ চরাইয়া হারে রে, রে, রে, রে, এ, এ।

সব সময় মিশ্রী মুখে রেখো—অর্থাৎ মুখে হরিনাম রাখ—নাম

রসামৃত।

* * *

আমি দেখছি জগৎময় একটি বাগান, তোরা এই বাগানে ফুলের মতো চারিদিকে ফুটে রয়েছিস। আমি একই বাগানের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাত্র।

* * *

হে পরম পুরুষ। জগৎ পতি পত্নি পিতা মাতা সন্তান এবং সৰ্ব্ব রুপে স্থিত। দেখিতেছি মায়া মোহে আবৃত হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। বিশুদ্ধ তার অটল বিশ্বাস ও আকুল পিপাসা নিয়া চলিতে থাক, তার স্বরূপ অবশ্য দেখিতে পাইবে।

* * *

তাইত বলা হয় সময় থাকতে থাকতে ভিতরের আলো জ্বালাবার চেষ্টা করো। মনের চুল্লীতে আত্মবিচার বা নামের আগুন ধরিয়ে দেওয়া। সাধুসঙ্গ প্রার্থনা ও উপাসনাদির বাতাস দিয়ে সে আগুন সতেজ রাখো। ক্রমশঃ, এর জ্যোতি স্থির হয়ে যাবে। তখন সে আলোতে ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে আত্মদর্শনের পথ সুগম করে তুলবেই।

* * *

এ শরীর আত্মরূপে সর্বময় ব্যাপ্ত, সকলের মধ্যে স্থিত, বিশ্ব, বিশ্বাতীত সকলের সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ। এ শরীর কারুর নিকট নূতন নয়—“পুরাতন“—পূর্ণতন অর্থাৎ পূর্ণতনু সকলের শরীর মিলে যে এক শরীর সেই মায়ের শরীর অর্থাৎ সকলের সঙ্গে অভিন্ন—এক আত্মা।

* * *

এই যেমন তুমি আমি দুইজন। আবার তুমি আমি একই। এই যে দুজনের মধ্যে শূন্যে আছে এও আমিই কিন্তু দুই-এর কোন কথাই নেই। রাগ দ্বেষ হয় দুইভাব হতেই।

* * *

কোন রোগের কি মূর্তি আমি দেখতে পাই। এ শরীরে তারা যখন আসতে চায়, আমি কোন বাধা দিই না। যখন এক আমিই তখন ত্যাগ বা গ্রহণ কোথায়? তোদের নিয়ে আমার যখন আনন্দ, তাদের নিয়ে ও তেমন জানিস।

* * *

জপ সমর্পণ করতে করতে আস্তে আস্তে প্রকাশ হতে লাগলো—নাম নামী কে? আমি কে? নিজেকে পাওয়াটা কী? এটা যখন প্রকাশ হলো তখন জপে পরিপূর্ণতা এলো। কাজেই জপ করেই যাওয়া। উন্মুখ হয়ে থাকা—যে মুহূর্তে প্রকাশ হবে তোমার যা সব অর্পণ—সব কিছুই ফিরে পাবে।

* * *

কাঁদছো কেন? তুমি সর্বত্র গুরুদেবকে দেখতে চেষ্টা করো। গুরু কি এতটুকু? মনে করো আকাশ, বাতাস। গুরু এই যে বস্ত্র পরেছি এও আমার গুরুর। এইভাবে তিনি আমায় জড়িয়ে আছেন। আমার হাড়, মাংস সবই গুরু। গুরু ছাড়া কিছুই নাই। আমার প্রাণ, বায়ুরূপে গুরুই আছেন। এই ভাবে সবটার সর্ববস্থায় তাঁকে সবটার ভেতরে তাঁকে পেতে চেষ্টা করো।

* * *

এই শরীরটাকে যে একবার ভালবেসেছে সে শত চেষ্টা করেও এ শরীরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না। যদি কেউ "মাকে" সত্যি ভালবাসে তবে নিশ্চয় জেনো যে, সে "মার" খেয়ালে।

* * *

ভগবানের অনন্তভাব, অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, আবার তাঁর মিলনের রাস্তাও অনন্ত। কেবল মাত্র তাঁকে পাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যে নিত্য মিলনে রয়েছ, তা জানার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার আশ্রয়ে উন্মুখ হয়ে থাকা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

* * *

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে, তাকে জানাবে। আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণাগতি প্রার্থনা করবে।

* * *

কৃপা হ'ল, পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। পূর্ব জন্মে যে সব সৎকাজ করেছ, তাই এই জন্মে কৃপা রূপে তোমার নিকট আসছে।

* * *

জীবের দেহের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আত্মার দিকেই লক্ষ্য রেখে জীব সেবা করবি। তা' হ'লে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি, সেবা, সেব্য ও সেবক তাঁরি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

* * *

একটি শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে শব্দ করো, তোমার শব্দের প্রতিধ্বনি জাগবে। তেমনি মনকে যতো শূন্য করে তুলতে পারো, তোমার স্বরূপ আপনি ফুটে উঠবে। যার যে ভাবে ভালো লাগে তাঁকে ডাকো, তাঁর মহিমার কথা ভাবো—তাঁর ভাবের মধ্যে তোমার সকল কামনা ডুবিয়ে দাও, তিনি আপন স্বরূপে দেখা দেবেন।

* * *

যতক্ষণ আমি ততক্ষণ তিনি নেই, আমার মৃত্যু তাঁর প্রকাশ।

* * *

নিন্দাটা হইতেছে গোবরের ন্যায়। গোবর এমনি পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। উহাই যদি মাটীর সঙ্গে মেশানো হয় তবে সার হয় ও গাছের গোড়ায় দিলে ফুল ফল শস্য হয়, সেইরূপ নিন্দাটা সহন করিলে অর্থাৎ গায়ে মাখিয়া নিলে ফল ভালই হয়।

* * *

তোমার সদ্‌ভাবগুলি যে যে কর্মে উদয় হয়, সেগুলি বেছে বেছে ধরে থাকা, ইচ্ছে না করলেও সেই ক্রিয়ায় লেগে থাকা। ওখানে চঞ্চলতা প্রবেশের কোনো ছিদ্র থাকবে না। শরীরকে সুখ দেয়া মানে ভগবদভাব হ'তে স'রে থাকা। রসাল খাদ্যে রসনাকে তৃপ্ত করা ভগবদ্-রাজ্য হতে তফাতে সরে থাকা। তাই যা কিছু খাওয়ার, সময়ে খাওয়া, ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করা।

* * *

যেমন এক বীজতে অনন্ত বীজ, অনন্ত ব্রহ্ম। আবার অনন্তের ভিতরেও সেই অন্ত, একই। তাঁকে নানা দিকে পাওয়া, নানা ভাবে পাওয়া, সর্বরূপ সর্ব্বাধিক, আবার নানাত্বের বাইরে যেতে হবে। বাইরে ভিতরে সর্বাঙ্গীন পাওয়া চাই। যা কিছু শোন, তোমাদের এই দৃষ্টি। অর্থাৎ

এই চশমা দিয়ে দেখ কিনা, কাজেই দেখার ভুল থাকে। লক্ষ্য ছোট করে রেখো না। সেই পরম পদে লক্ষ্য রেখো। সেই যে সর্বাঙ্গীন, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অখণ্ড পূর্ণ তাঁকে পেতে হবে।

* * *

আচ্ছা মা, তিনি ত স্বয়ং প্রকাশ, তবে আমরা তাঁকে ডাকবো কেন?

মাঃ, আমি ত কিছুই জানি না বাবা। তবে যা বলাও তাই বলছি। দেখ না মাটির ভিতর বীজটা থাকাকালীন তার এমন একটি শক্তির প্রকাশ হয় যাহাতে মাটিরও একটা স্পন্দন হয় ও গাছটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিটা ফাটিয়া যায়। সেই রূপ তোমাদের 'আমার কি উপায়' এই যে ব্যাকুলতা ইহাও জানিও জমির স্পন্দন। এই স্পন্দন তিনি স্বয়ং প্রকাশ হইবেন বলিয়াই হয়। জীব মাত্রেরই স্বভাব তাঁকে চাওয়া।

* * *

এই যে গান হইতেছে, এই আমরা সাধনা করিতেছি। এই যে সাময়িকের জন্যও মনটা গান শুনিয়া উদাস হইয়া যাইতেছে, এও মহা সাধনা।

* * *

"সুরপদ তাল দ্বারা সেই অখণ্ডকে স্পর্শ করা যায়। রামপ্রসাদ যেরূপ গানের দ্বারা মাকে পেয়েছিল সেইরূপ তোমার ভিতরে এই যে শক্তি এ তাঁরই দেওয়া—এর দ্বারা তাঁকে পাবার চেষ্টা কর।"

* * *

মাঃ রান্নাঘরের দরজায় দাড়াইয়াও কিছু কিছু পাওয়া যায়। কি বল?

ভক্তঃ হ্যাঁ, মা কথা আছে 'ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন।'

মাঃ কি রকম জানিস, যেমন সাধুসঙ্গ করিলে ধীরে ধীরে তার প্রভাব পড়ে। সাধকের কি হচ্ছে? না পাক হচ্ছে। সাধুসঙ্গ করতে করতে ধীরে ধীরে পাক হতে থাকে। এইরকম আর কি? আমি সেই পাকের কথাই বলছি। তোদের হাতা-বেড়ির পাকের কথা বলি নাই।

* * *

সৎসঙ্গ কি? না—স্ব মানে সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আত্মস্বরূপ যা বল। স্ব-এর সঙ্গ, স্ব-অঙ্গ অর্থাৎ স্বই একমাত্র স্বয়ং কিনা।

স্ব-অঙ্গ মানে সঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। যে সঙ্গ করা হওয়ার জন্য ইহার জন্য ব্যাকুলতা চাই্।

*　　　*　　　*

আমি অর্থাৎ আত্মস্বরূপ। যতটা তোমার শক্তি ততটা করে যাও। কোন একটা শক্তি লাগতে লাগতে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এই যাত্রায় যা সড়ে যাবে। আর ধীরে ধীরে বা নিত্য, সত্য, মুক্ত, বুদ্ধ তা প্রকট হবে। লক্ষ্যে সর্বদা দৃষ্টি রাখা। লক্ষ্যভেদের জন্য যেমন তাক লাগিয়ে রাখা। 'তুমি', 'তুমি' করে আপনাকে ডোবাও আর 'আমি', 'আমি' করে তোমাকে ডোবাও।

হাঁড়িতে যখন চাল ফোটে তখন একটা প্রেসার সৃষ্টি হয়, যাহার দরুণ উপরের ঢাকনা আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িয়া যায়। জোর করিয়া তাহা আর খুলিতে হয় না। এইরূপ আমাদের যতটুকু শক্তি, তাহা কাজে লাগাইলে বাকীটা তিনি করিয়া নেন। ভাব অভাব হইতে ব্যাকুলতা আসে, তাহাতেই স্বরূপ প্রকাশের পথ খুলিয়া যায়।

*　　　*　　　*

টাইম টেবিলে কি সব লিখতে পারে? যাহারা সেই পথে চলে তাহারা বুঝে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য, তাহা ছাড়া আরও কত কি বিষয় আছে। শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও কতকি দেখেন, জানেন। তবে যেমন টাইম টেবিল দেখিয়াই ট্রেনের পথ চলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র উপদেশ মতই প্রথম প্রথম চলিতে হবে। তবে শাস্ত্রীয় কথার ভিতর অনন্তভাব নিহিত থাকে কিন্তু।

*　　　*　　　*

শাস্ত্রত স্ব-অস্ত্র, যেন স্বভাবে স্থির হইবার জন্য যে যে কর্ম করা যায় তার মধ্যে যে এক লক্ষ্য থাকে আত্মচিন্তা, সেই যে একধারা অস্ত্র-রূপী চিন্তা, সেই অস্ত্র দ্বারাই খণ্ড খণ্ড সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রকে আমার আবোল তাবোল ভাষায় স্ব-অস্ত্র বলি, তোমরা সেই অর্থ কর না কেন।

*　　　*　　　*

আজন্ম তিনি পুর্ণজ্ঞানে স্থিতা। হরি কথাই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান এবং ভক্তদের কাছে উপহার।

১৯৮২ বা ২৭শে আগষ্ট মার শরীর ছাড়ার আগে তাঁর শয্যা শিয়রে দাঁড়ান নির্মলানন্দ স্বামী বলেন, "মা কী নিয়ে থাকবো?" মা বলেন, "ভগবানকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে,।" বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবিকা উদাশজীকে বলেন, "জপ বাড়াও" পাশে দাঁড়ান অন্যান্য সেবিকারা তখন শুনতে পান, মা খুব ক্ষীণ কণ্ঠে কয়েকবার বলেছেন, "নারায়ণ হরি"—এই তাঁর শেষ কথা।

* * *

সব আশ্রমই তো এই শরীরের। তোরা মনে করিস তোরা যে আশ্রমটি করেছিস্, সেইটেই শুধু এর, জগৎ ভরাই তো এই শরীরের একটি মাত্র আশ্রম, দুটো কোথায়?

(আ. বা. ৩/৫)

* * *

হৃদয় হল সব সুখ-দুঃখ অনুভবের স্থান কিনা? আবার প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ভগবানের আসন। যাঁর আসন তাঁকে বসাতে না পারলে চিরশান্তি হয় না।

* * *

অন্তর-গুহাবাসীত মানুষেরই হওয়া, অন্তরযামী ভগবানের প্রকাশ হবার জন্য।

স্বরূপ পরিচয়

- মায়ের স্বরূপ—মঃ মঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়
- ঢাকায় দার্শনিক পণ্ডিতদের মায়ের আত্মপরিচয় দান
- মায়ের আবর্ভূতস্বরূপ—মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ
- স্বরূপ পরিচয়—(মায়ের কথায় মা) সমর্পিতা
- বিবিধ

"ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে ধারণায় যা আনিতে পারি, শ্রীশ্রীমা তাহার-ই মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলা বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ—এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনি-ই একমাত্র পরম উপাস্য, ইহা স্থির বুঝিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে বসাইতে পারিলে পরমার্থ পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।

তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কোনো বাণী ব্যর্থ হইবার নয়, এবং তাঁহার স্মৃতি কালের অধীন নহে—ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।"

—পরম ভক্ত সাধক শ্রীমৌনানন্দ পর্বত
(ভাইজী) মাতৃদর্শন

মায়ের স্বরূপ

মায়ের শতবার্ষিকী উৎসব তো উদ্‌যাপিত হয়ে গেল, বেশ সমারোহের সঙ্গে, নানা আশ্রমে, নানা স্থানে। কোথাও বা নতুন করে তাঁর মূর্ত্তি স্থাপন করা হল, কোথাও বা সেই উপলক্ষ্যে ভাগবত-সপ্তাহ, ব্রহ্মসূত্রের পারায়ণ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানও হল, বিশিষ্ট সব মহাত্মারা এসে মায়ের সম্বন্ধে, শাস্ত্রের তত্ত্ববিষয়ে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে গেলেন। স্মারক গ্রন্থও অনেক প্রকাশিত হল। কিন্তু মা'কে স্বরূপে জানা গেল কি? তাঁর ক্রিয়ারূপের অনেক পর্যালোচনা হল—তিনি কী কী করেছিলেন, কী-ই বা বলেছিলেন। অলৌকিক কত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন কত মানুষের জীবনে। আমাদের কাছে ক্রিয়া বা কাজকর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয়, ক্রিয়া থেমে গেলেই সব শেষ, স্বরূপের বিলয়। তখন তিনি ছিলেন বা অতীতের বিষয় হয়ে যান। মাঝে মাঝে উৎসব করে আমরা আবার তাঁকে যেন জিইয়ে তোলার চেষ্টা করি। শেষে, তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পান, ইতি+হ+আস—এমন একজন একসময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই পরিচয়টুকু উৎকীর্ণ হয়ে থেকে যায়। কোথাও বা অধ্যাত্মক্ষেত্রে দেখা যায় সম্প্রদায়ক্রমে এক একজন মহামানব, অবতারকল্প পুরুষের প্রবর্তিত ধারার অনুবর্তন চলতে থাকে এবং তার মধ্য দিয়েই যেন তারা বেঁচে থাকেন। যেমন এ দেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, শঙ্কর সম্প্রদায়, নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে আজও বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যের ধারা প্রবহমান।

মা সেরকম কোনও সম্প্রদায় প্রবর্তন করে যাননি, যদিও তাঁর নামে অনেক জায়গায় অনেক আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। সেখানে গেলে হয় তো মায়ের মন্দির বা মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বইপত্রও পাওয়া যায়, যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মুখ থেকে মায়ের সম্বন্ধে কিছু শোনাও যায়। ক্রমে ক্রমে তেমন মানুষেরও অভাব হবে। যেমন চলে গিয়েছেন ভাইজি, গুরুপ্রিয়াদিদি, পরমানন্দ



স্বামী ও আরও নানা অন্তরঙ্গ ভক্তের দল। তখন তাঁর কথা আমাদের শোনাবে কে? তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাঁরাও কেউ যদি না থাকেন, তা হলে তাঁকে চেনাবে বা জানাবে কে?

তাঁকে তাই চিনতে হবে স্বরূপে। কালপথে যিনি এসেছিলেন শতবর্ষেরও পূর্বে রথচক্রের আবর্তনে, সেই কালবিহীনা কি হারিয়ে যাবেন? স্বরূপে তিনি আনন্দময়ী কিন্তু আমরা তাঁকে মাত্র এই নামে চিহ্নিত করে রেখেছি, সে-নামের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন নই। আমরা কেউই জানি না আমাদের আসল সত্তা কী। আমরা কি এই শরীরটুকু, দেহধারী এক জীব মাত্র? এ তো আজ আছে, কাল নেই। একান্তই অসৎ। তা হলে সৎ বা সত্য যে, তাকে তো আজও জানা হল না। শুধু অসৎ নিয়েই কারবার করে চলেছি। সুখ-দুঃখের তরঙ্গে ভেসে চলেছি, শেষে একদিন সব শেষ, তরঙ্গ থেমে গেল, জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। উপনিষদ বলছেন: 'যো অবিদিত্বা প্রৈতি স কৃপণ': যে না জেনে চলে যায়, প্রয়াণ করে, সে বড় কৃপণ, বড় দীনহীন, বড় সংকীর্ণমনা। এইটুকু নিয়েই থাকল। এর বাইরে একটু চোখ মেলে চাইল না। খুঁজল না, জানল না সেই সৎকে, সত্যকে। আমরা তাই নিজেকেও জানিনা, মাকেও জানিনা, চিনিনা স্বরূপে। মা আড়াল থেকে হাসেন, ভাবেন, বলেন:

'তুমি মোর পাও নাই, পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়।'

জানতে হবে তাঁকে 'পরমপ্রকাশরূপে', যেখানে সব আবরণ হবে লয়। সতের পরেই তার চিৎ বা চৈতন্য বা প্রকাশরূপ বোধ। সেই বোধ জাগে যার, তারই মধ্যে ফুটে ওঠে আনন্দ। মা সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী, তারই আর এক নাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তাকে কি লেখা দিয়ে বা কথা দিয়ে জানা যায় বা জানানো যায়? 'বুঝে লহ যে জানো সন্ধান।'

মঃ মঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়
"শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী স্মরণ মহোৎসব ১৯৯৬-স্মরণিকা"

ঢাকায় দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রশ্নে শ্রীশ্রীমায়ের আত্মপরিচয় প্রদান

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র সরকার মহাশয়ও আসিয়াছেন। মার নাম শুনিয়া তাঁহারা সকলে আশ্রমে আসিয়াছেন। ঢাকারও প্রফেসারেরা কেহ কেহ এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাকে নিয়া তাঁহারা সব বসিয়াছেন। নানা কথা হইতেছে। মার জীবনের পূর্ব্বকথা সব তাঁহারা শুনিতে চাহিয়াছেন। মা যত টুকু পারেন, বলিতেছেন। কেহ কেহ এ সব ঘটনা লিখিয়াও নিতেছেন। কথা উঠিল, মাকে মার মামাত ভাই নিশিবাবু এবং জানকী বাবু বাজিতপূরে মার ভাবাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কে?" মা বলিয়া যাইতেছেন, "তার পর মুখ হইতে কি বাহির হইল" এই বলিয়াই, অন্য কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ঐ স্থানেই বিশেষ করিয়া ধরিলেন, "আপনার মুখ হইতে কি বাহির হইয়াছিল?" এ দিকে তখন হইতেই মার নিষেধ ছিল, যাহা বাহির হইল, তাহা যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারা কেহ যেন প্রকাশ না করেন। আজ বহু বৎসর পর সেই কথাই উঠিয়া পড়িয়াছে। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার বলিতে কি? আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু বলি নাই। যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে" এই বলিতেই মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষুও সজল হইল। মা বলিলেন, "আমার মুখ দিয়া তখন বাহির হইয়াছিল "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। এই বলিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলেন। কিন্তু কথা চলিতে লাগিল। পরে নিজের দীক্ষার কথা বলিলেন। ভোলানাথের গুরু কে, ও তাঁহার দীক্ষার বিষয় সব বিস্তারিত তাঁহারা জানিতে চাহিলেন। মা ভোলানাথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া, অনুমতির অপেক্ষা করিলেন। ভোলানাথ ইসারায় নিষেধ করায় মা বলিলেন, উনি নিষেধ করিতেছেন। সেই কথা আর কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। মা ঘরে আসিয়া কেমন হইয়া পড়িলেন। মুখ দিয়া আত্মপরিচয় বাহির হওয়ায় শরীর কেমন লইয়া গেল; শুইয়া পড়িয়া

রহিলেন। ভোলানাথ বলিলেন, "কেন বলিলে? তুমিই ত নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলে।" মা বলিলেন, "আমি ত কিছুই নিজে ইচ্ছা করিয়া করি না। বোধহয়, সময় হইয়াছে, তাই এই ভাবে বাহির হইল।" অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা পড়িয়াছিলেন ও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

মা যুগপৎ সসীম ও অসীম

মা যে যুগপৎ অসীম ও সসীম, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে নিম্নোলিখিত প্রশ্নোত্তরে—

প্রশ্ন: মা! তুমি যখন অখণ্ডভাবে থাকো, তখন কি আমাদিগকে দেখিতে পাও?

মা: তুমি যে খণ্ডভাবের কথা বলিলে, তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, অথচ সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বল, তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই। আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। কাজেই আমি সসীম। আবার, আহার-নিদ্রার কোনও প্রয়োজনই আমার নাই, কাজেই আমি সীমাশূন্য। কোন ছেলেপিলে এ শরীরের কাছে আসিলে এ শরীর তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে, তাদেরই মত একজন হইয়া যায়। আবার, মহাপুরুষেরা যখন এ শরীরের কাছে আসেন, তখন এ শরীর তাঁহাদের ভাবেই তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলে। কত আত্মা-কেবল ভাল আত্মার কথা বলিতেছি না, কত খারাপ আত্মাও এ-শরীরের কাছে আসে। তখন শরীর তাহাদের ভাবেই তাহাদের সঙ্গে আলাপ করে, তাহাদের যাহা প্রয়োজন তাহা পূরণ করে। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি অখণ্ডভাবে তোমাদিগকে দেখিতে পাই কিনা। আমি বলি, তোমরা কেন, যে এ শরীরকে কখনও দেখে নাই, তাহার প্রয়োজন হইলে তাহাকেও এ শরীর দেখিতে পাবে, তাহার অভাব দূর করিয়া থাকে।

প্রশ্ন: তাহা হইলে আমরা তোমার বিষয়ে চিন্তা করিলে তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাও?

মা: হ্যাঁ, টর্চের আলো ফেলিলে জিনিষগুলি যেভাবে ফুটিয়া উঠে, তোমরা যখন এ শরীরের কথা চিন্তা করো, তখন তোমাদের মূর্তি এ শরীরের মধ্যে সেইভাবে ফুটিয়া উঠে।

একদিন কাশীতে সৎসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল, যদিও মা স্বরূপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিতা, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসতে হলে তাঁকে একটু নামতে হয়।

যেমন, রাজা হয়েও মেথরের ভূমিকায় অভিনয়ে তাঁকে তাৎকালিক মেথরের ভাবে ভাবায়িত হতে হবে। উত্তরে মা বললেন, "যদি অভিনয় করতে হয়, তবে নামা-ওঠার প্রশ্ন তো হয় না। স্বরূপে থেকে নিজেকে নিয়ে নিজে খেলছেন। কিন্তু যদি নামা-ওঠা বলো, তবে সেই স্থিতি কোথায়? যদি সেই স্থিতি বলো তবে দ্বিতীয় অস্তিত্ব? এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—
শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীশ্রীমার আবির্ভূত স্বরূপ

(মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজের চিঠি)

আজ সকালে মার নিকট বসিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একখানি চিঠি আসিয়াছে। তিনি আমার ডায়েরীর একস্থান পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে চিঠিখানি লিখিতেছেন। চিঠিখানি আমাকে লিখিতেছেন। চিঠি খানির অংশ এইস্থানে দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম তাই দিতেছি।

"মার আবির্ভূত স্বরূপ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উপস্থিত হয় অথচ ঐ প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান ডায়েরীতে নাই। আমার মনে হয় ইহার একটা মীমাংসা থাকা উচিত। বলা বাহুল্য আমি সাধারণ পাঠকের মানসিক অবস্থার দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি।

মার দেহ যে সাধারণ মনুষ্যের দেহ হইতে ভিন্ন প্রকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ মনুষ্য এমন কি দেবতাবর্গও গুণের অধীন। কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকলে দেহের বিকাশ হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই সাধারণ মনুষ্য ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। দেহ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হয়। অথচ দেহাত্মবোধ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট না হওয়ার দরুন তাহাদিগকে ঐ দেহাশ্রয়ে অনেক অভিনব কার্য্যও সম্পাদন করিতে হয়। আর, যে সকল দেবতা অথবা সিদ্ধ পুরুষাদি জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য করুণা-পরবশ হইয়া মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হন ও নরদেহ গ্রহণ করেন, দুঃখক্লীষ্ট জীবের দুঃখে তাঁহারা ব্যথিত হ'ন বলিয়াই স্বেচ্ছায় দুঃখময় নরদেহ গ্রহণ করেন ও তদ্বারা নরলোকের সেবা করেন। তাঁহারা আনন্দময় ভাবের পুরুষ—জীবকে দুঃখরাজ্য হইতে সেই আনন্দময় ভাবের মধ্যে নিয়া যাওয়াই তাঁহাদের অবতরণের লক্ষ্য। করুণার সার্থকতা এই পথেই উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য এই সকল মহাপুরুষ শুদ্ধ ভাবময় হইলেও একান্তভাবে সর্ব্বভাবের অতীত নহেন। সাধারণ মনুষ্যে তিনটি গুণই সমধিক ভাবে কার্য্য করে, কিন্তু মহাপুরুষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই মাত্র কার্য্য করে।

আর মা'র দেহ গুণের অতীত বলিয়া একদিকে তাহাতে কোন গুণই কার্য করে না, অথচ অপর দিকে তাহাতে জীবের ভাবনা অনুরূপ বা প্রকৃতি অনুসারে যে কোন গুণ বা ভাব কার্য করে বলিয়া মনে হয়। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মার মুখেও এই ভাবের কথা অনেক শুনিয়াছি, ইহার তাৎপর্য্য কি? স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে যে বর্ণ উপস্থিত হয় দর্পণও তদনুরূপ বর্ণেই অনুরঞ্জিত হয় বলিয়া মনে হয় (যদিও বস্তুতঃ দর্পণ সর্ব্বদাই আপন শুদ্ধ স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।) মা কোনও ভাবে আবদ্ধ নহেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে দ্রষ্টা আপন ভাবই দেখিতে পায়। সেই জন্য মাকে, যে'ই যে ভাবে পাইতে বা দেখিতে ইচ্ছা করে, সে তাঁহাকে সেই ভাবে পাইতে বা দেখিতে সমর্থ হয়। ভাবাতীত হইলেই যাবতীয় ভাবের সঙ্গেই অভিন্নতা স্থাপিত হয়। অথবা সর্ব্বভাবের পূর্ণতা লাভ না হইলে ভাবরাজ্য অতিক্রম করা যায় না।

কিন্তু মা যদি ভাব বিশেষে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বময় মুক্ত স্বভাব তাঁহাতে অপ্রকাশিত আছে বলিতে হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে যে ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ঐ ভাবই সর্ব্ববিজয়ী হইয়া তাঁহাতে বিরাজ করিবে। অন্যভাব তাঁহার সংস্পর্শে থাকিতে পারিবে না। আলোকের সীমার মধ্যে যেমন অন্ধকারের কোনই স্থান নাই, তেমনি একটি শুদ্ধ ভাবের ক্ষেত্রমধ্যে অন্য কোনও ভাবের আবির্ভাব হইতে 'পারে না। মা যদি সত্যই বিশুদ্ধ মাতৃভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, তাহা হইলে কোন লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে ও ঐ সর্ব্বাতিশায়ী মাতৃভাবের প্রভাব অনুভব করিতে হইবে। তাহার মনে যে কোন ভাবই থাকুক না কেন, তাহাই অভিভূত হইয়া যাইবে। সে মায়ের কাছে আসিবামাত্র বুঝিয়া হউক, অথবা না বুঝিয়া হউক, মাকে "মা" বলিয়া ধারণ করিতে বাধ্য হইবে, অন্যভাব তাহার মনে উঠিতেই পারিবে না। প্রত্যেকটি শুদ্ধ ভাবেরই এমনই অসীম প্রভাব।

আর, মা যদি ভাবতীত হন, তাহা হইলে বলা যায় কোন ভাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথচ সকল ভাবেই সমরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি

অপ্রতিষ্ঠিত ও নিরালম্ব ব্রহ্মভাবে নিত্যমুক্ত স্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজমানা। এই ক্ষেত্রে ভাবশুদ্ধির কোন প্রশ্ন নাই। যে তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতে চাহিবে, তাহার দৃষ্টিতে তিনি সেইভাবেই প্রতিভাত হইবেন। তাঁহার আপন ভাব নাই বলিয়া ভাবুকের ভাবই তাঁহার ভাব। এই স্থলে ভাবুকের ভাব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেহ তাঁহাকে মাতৃভাবে, কেহ তাঁহাকে পিতৃভাবে, বা সুহৃদভাবেও দেখিতে পারে, আবার অন্যভাবেও পারে। তিনি কোনও ভাবের অধীন না হইলেও সকল ভাবেই দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন। সাত্ত্বিক সত্তা ও গুণাতীত সত্তার পার্থক্য এইভাবে পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন এই—ঘনিষ্ঠভাবে মার সংসর্গে থাকিয়াও ভোলানাথের মনে ক্ষুদ্র বৃত্তির উদয় হইয়াছিল কেন? যদি বলা যায়, মা গুণাতীত বলিয়া গুণের খেলায় বাধা দেওয়া তাঁহার স্বভাব নহে, কাজেই ভোলানাথ যাহা কিছু ভাবিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রাক্তন সংস্কারের প্রেরণাতেই করিয়াছেন। মা তাহার পোষণও করেন নাই, খণ্ডনও করেন নাই। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মা গুণাতীত, অথচ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মায়ের সংসর্গের ফলে ভোলানাথের জীবনে ও মনে অসাধারণ উৎকর্ষ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে মানিতে হয়, মা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। যদি তাহা না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সংসর্গের ফলে ভোলানাথের জীবনের পরিবর্ত্তন বোধগম্য হয় না। কারণ গুণাতীত বস্তুর সংস্পর্শে মনুষ্য আপন ভাবেরই পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। আপন ভাব পরিহার করিয়া ভাবান্তর গ্রহণ করিতে পারেন না। যেমন, সূর্য্যের আলো গৃহে প্রবৃষ্ট হইয়া গৃহস্থ বিভিন্ন বস্তুকে প্রকাশিত করে মাত্র, কোনও নবীন বিশিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি করে না, তেমনি, নির্গুণ চৈতন্য সত্তার প্রভাবে প্রত্যেক আধারের বীজগত বৈশিষ্ট্যটাই অভিব্যক্ত হয়—যে আধারে যাহা নাই, তাহা অভিব্যক্ত হয় না। ইহার প্রকৃত মীমাংসা সহজ। আমার মনে হয়, 'সাত্ত্বিক—সত্তা' ও গুণাতীত 'মুক্ত-সত্তার' পার্থক্য এই যে, 'সাত্ত্বিক সত্তার' প্রভাবে মলিন ভাব অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়—মলিন ভাব একেবারে নষ্ট হয় না। যখন, ঐ প্রভাবশালী 'সাত্ত্বিক সত্তা' নিষ্ক্রিয় হইবে, তখনই

ঐ সকল অভিভূত মলিন ভাব আবার প্রবল হইয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। সত্ত্বগুণের প্রভাবে মলের সাময়িক তিরোভাব হয় মাত্র। কিন্তু নির্গুণ সত্তার প্রভাবে মলিন ভাব ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংস্কারগত মলিনতা সবই বৃত্তিস্বরূপে ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইতে থাকে। চরমে, এমন অবস্থা আসে, যখন মলিনতার সংস্কার মাত্রও থাকে না।

শ্রদ্ধের গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের চিঠির কথায় আরও কথা উঠিল। কথায় কথায় মা বলিলেন, গোপীনাথ, 'নাথ' কিনা—তাই গুপ্ত কথা বাহির করিতে পারে। সত্যই দেখ, প্রথম প্রথম যখন ক্রিয়াদি হইত, তখন ভোলানাথ কোনরূপ বাধা দিত না; এই কথা অনেক বারই তোদের নিকট বলিয়াছি। তখনকার একটা কথা খেয়াল হইল। সব কথা ত সব সময় খেয়াল হয় না, তোরা কথায় কথায় বাহির করিস্। তখন ভোলানাথ আশ্চর্য্য হইয়া মধ্যে মধ্যে বলিত, 'আমিও যে ভাল হইয়া গেলাম।' নিজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেই সে অবাক হইয়া যাইত। এই রকমই হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে আসিলে লোকের অন্য সব ভাবগুলি কিভাবে অভিভূত হইয়া যায়, বোধ হয় এই সময় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—গুরুপ্রিয়াদেবী)

(দ্রঃ—মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রথমভাগে" মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সেটা দীর্ঘ হওয়ায় স্থানাভাবে এখানে দেওয়া গেল না।)

(দিদিমার কথা)

আইবা, যাইবা, থাকব না
খাইবা, দাইবা, চাইবা না
কোন আপদ পাইবা না।

স্বরূপ পরিচয়

কে কার কথা লিখে? যার যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে ত। যা হবার হয়ে যাচ্ছে। জগতে কত ভুরি ভুরি বই লেখা হচ্ছে। এ শরীরটা কাউকে লিখতেও বলে না, বাধাও দেয়না। উপস্থিত যা কিছু হচ্ছে তাঁর ভিতরেই সব। আমি কি করব? তোমরা যেমন বের করাচ্ছে তেমনই শুনছ। এক ছাড়া কিছু আর আছে নাকি? দেখ, কি চমৎকার, কেউ এই শরীরটাকে হয়ত নিন্দা করছে। কিন্তু কথাটা কি জান? যে বলছে যা বলছে সবই তুমি না হয় আমি। একমাত্র এক আত্মাইত। আবার আমি তুমিই বা কোথায়? কোন গোলমাল নেই। এইসব কিন্তু বিচারের কথা না। সত্য প্রত্যক্ষ কিন্তু।

জীবের সংস্কার অনুরূপী দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন হয়। আমি আগেও যা এখনও তা পরেও তা; তোমরা যখন যে যা বল, যে যা ভাব আমি তাই। তবে ইহা খাঁটি যে এই শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয় নাই। তোমরা মনে করনা কেন এ-শরীর একটা ভাবের পুতুল, তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ। এখন একে নিয়ে সাময়িক খেলা করে যাও।

ব্যবহারিক হিসাবে ধরতে গেলে এ-শরীর পূর্ব বঙ্গের; প্রজাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ সকল কৃত্রিম উপাধি হতে আলাদা করে দেখলে জানতে পারবে, এ-শরীর তোমাদের সকলেরই পরিবারভুক্ত।

এ-শরীর তো একটা পুতুল, তোরা যেমন খেলাতে চাস এ তেমনিতরো খেলতে থাকে, আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই। আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য এ-শরীরের নিজস্ব যদি কিছু বলিতে চাও তবে জগৎময় সবই ইহার নিজস্ব।

যেরূপ মাথা, হাত, পা, ইত্যাদি—সব নিয়াই একটি মানুষ, সেরূপ আমি দেখি, তোরাই তো সব এ-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ। সাধারণ—অসাধারণ সব তোদের কাছে, আমি সকল সময়, সকল অবস্থায় একভাবেই রয়েছি, সবই তো খেলা; তোদের খেলার সাধ আছে, তাই হাসি-তামাসাতেও এই শরীরটাকে তোরা টেনে নিয়ে যাস, বেশ সুন্দর করে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ, তাহলে খেলার ভেতর

দিয়েই খেলার চরম পাবি, বুঝলি?

এ-শরীর ত একটা ঢোল, তোরা যে তালে বাজাবি সেইরূপ আওয়াজ ত পাবি। আমি দেখতে পাই, সর্বত্রই একেরই খেলা চলছে।

যা বল তাই। (নিজের দিকে দেখাইয়া) অর্থাৎ, যা হতে পূর্ণ প্রকাশ আর কি। (আবার নিজের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এতে কিন্তু তোদের দৃষ্টিতে যতরকম সাধনা ইত্যাদির মত সব কিছু হতে পারে। সবই প্রকাশ হতে পারে। অবাধ গতি, অবাধ প্রকাশ আর কি—তার কথা সেই বলছে কিনা, তাই কার কাছে সঙ্কোচ দ্বিধা? অন্য কারো বলতে কথাই নাই। নিজের কথা নিজেকেই বলা, যাই বলনা কেন।

* * *

আমিই আমাকে নিন্দা করি, আমিই আমার প্রশংসা করি, দর্শন, নিন্দা, প্রশংসাটাও আমিই। আমি কাহারও খাই না, কাহারওটা নেই-না, কাহারও বাড়ী যাইনা, কাহারও সঙ্গে কথা বলি না।

* * *

তুমি যে খণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমকে যদি খণ্ড বল, তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়, আবার আমাকে যদি অখণ্ড বল, তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই; আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। আমি খাইতেছি, ঘুমাইতেছি, এগুলি আমার খণ্ডভাব, কাজেই আমি সসীম, আবার আহার-নিদ্রার আমার কোনই প্রয়োজন নাই, কাজেই আমি সীমাশূন্য।

("মায়ের কথায় মা"—সমর্পিতা)

* * *

এক ভক্ত আকুল হয়ে মায়ের জন্ম কথা শুনতে চাইলেন। মা বললেন, 'বৈশাখ মাস, বৃহস্পতিবার, রাত্রি অবসানের দিক দিয়া। ব্রাহ্মমুহূর্ত স্পর্শে, খেওড়ার এক ছোট্টখড়ের ঘরে তোদের দৃষ্টিতে এই শরীরটা। প্রায় পূর্ব উত্তর কোণের দিকে মাথা। শরীর কিন্তু তোদের দেখায়

সেই সময়, মাথা উপরের দিকে একটু গতি—বলিতে-বলিতে মা চুপ, কেমনই এক ভাব। পরে বলিলেন— রকমারিটা আর কি। একটু থামিয়াই হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, ঐ সময়ই কিন্তু ঘরের চালের ফাঁক দিয়া আকাশ ও নিম গাছের ডাল পাতাগুলিও বেশ সুন্দর দেখাইতে ছিল। যেমন তোকে উপস্থিত দেখা।

মা জন্মের পর কাঁদেন নি। পরবর্তীকালে মা বলেছিলেন, "কাঁদবো কেন? আমি যে তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আম গাছ দেখছিলাম।"

* * *

"কে এই মা, কি-ই বা তাঁর পরিচয়?" প্রশ্নটি মা শুনতে পেয়ে স্বগতভাবেই বলেছিলেন—'অব্যক্তধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিনানন্দ ঘনশ্যাম নাম।" অন্যত্র কথা প্রসঙ্গে মা'র শ্রীমুখ থেকে আমরা শুনেছি—

বলো কোন দেশে?—নাই দেশে।

বাড়ী কোথায়?—ব্রহ্মনগরে।

জিলা?—ব্রহ্মজিলা।

কে আছে?—আত্মনন্দ।

* * *

ভাবটা জাগিত আমি একা। আত্মীয় স্বজন কাহারও সঙ্গে যে কোন আকর্ষণ নাই, কেউ নাই। এক বিরাট শূন্য এবং বিরাট জ্যোতি। আবার একমাত্র জ্যোতিই, আর কিছুই নাই। আবার আমিও ঐ একই জ্যোতি।"

* * *

"এই শরীরটা কি রকম দেখছি জান? যেন মাখন দিয়া গড়া আর তাতে উজ্জ্বল শুভ্র ঘন জ্যোতি। বললেও বলা হয় না। আর সেখানে বটপত্রে শিশুরূপী ভগবান আপন পা আপনি চুষছেন। ঠিক সেই রকম মূর্তি। তবে শোয়া অবস্থায় না—বসা। নধর নধর শরীর। বসে বসেই ঐ ভাবে পাটা চুষছেন। পূর্ণরূপ-রংটিতে যেন কি রকম একটা গভীর নীল জ্যোতি-অপূর্ব কান্তি। তবু কিন্তু বলা হল না। পাশেই একটি অতি সুন্দর ছোট্ট শিশু মেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার শুভ্র জ্যোতিতেও যেন সব আলো করে আছে"। শিবপুরাণ বর্ণিত নারায়ণী এবং নারায়ণ দিব্য

ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা জ্যোতির্ময়ী এবং জ্যোতির্ময়। অভয় মার সামনে ছিলেন এবং তিনি বলে উঠেছিলেন "পুরুষ প্রকৃতি"। মা অভয়ের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অভয় ব্রহ্মময়ী মাকে আবার প্রশ্ন করলেন—"মা, আপনার ভিতর থেকেই এই সব বের হয়েছে তো?" মা মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন। গুরুপ্রিয়া দিদি বললেন, "মা, তোমার শরীরের ভিতর থেকেই বের হল এসব তাহাও দেখেছ-তো?" মা বললেন—"বাহির আবার কি হবে? আছেই ত সব"।

(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী অষ্টমভাগ, পৃঃ ১৬৬-৬৭)

* * *

মা বলেছেন—"এবারে এই শরীরটা এত সহজ হয়ে এসেছে যে একে কেউ চিনতে পারবে না।" এতদ্বারা মা পরিস্কার স্বীকৃতি দিচ্ছেন বারে বারে তিনি এসেছেন, আসেন, আসবেন। মায়ের এই স্বয়ং উক্তি কি গীতায় শ্রীভগবানের সেই শাশ্বত উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় না? "পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এর পরেও মা আবার আর এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছেন—এই শরীরটার যাওয়াও নেই, আসাও নেই, এই শরীরটা সদাই তোদের সঙ্গে আছে। এদ্বারা আমরা কি বুঝবো মায়ের এই উক্তি প্রমাণ করে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহ-অবস্থান, কোন সন্দেহের অবকাশ কি আছে এই ধারণায়। মা বলেছেন "এই শরীরটাকে নিয়ে খেলা করতে পারে। তোমাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ এই শরীরটার মধ্যে পাবে। তাই বোধ হয় কেউ মাকে শ্রীদুর্গা, কেউ কালী, কেউ শ্রীকৃষ্ণ, কেউ শ্রীগৌরাঙ্গ, কেউ কেউ আবার নিজঅন্তরের স্বরূপে মাকে দর্শন করেছেন। তার মানে সর্ব্বভাবের সর্ব্বময় আধার হলেন স্বয়ং মা। তাই দেখি মুসলমান ফকির মাকে নমাজের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাতে জিজ্ঞেস করায় ফকির সাহেব দ্বিধাহীনভাবে বললেন "যখন নমাজ পড়ি শ্রীমায়ের জ্যোতির্ময়রূপটি আমার হৃদয়াকাশে ফুটে ওঠে, তাই তো ছুটে আসি আমার আল্লাহ-তালাকে দর্শন করতে। খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেব মাকে দেখে বলছেন—বাইবেলে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যা বর্ণনা পাই শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীমূর্ত্তিতে তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই, তাইতো এত দূর থেকে তাঁকে

দর্শন করতে আসি বার বার।

একজন ঠিকই বলছিলেন যে, মা কারোর ধর্মপরিবর্ত্তন বা গুণ পরিবর্ত্তনের কথা কখনও বলতেন না। কিন্তু মায়ের সান্নিধ্যে এলে অনিবার্য্যভাবে মাতৃ-দর্শনকারীর স্বকীয় ধর্মীয়ভাব বা আধ্যাত্মিকভাব তীব্রভাবে বেগবান হয়ে উঠতো অর্থাৎ মায়ের কাছে এলে সঠিক ইষ্ট-নিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়ে উঠতো, তাতে সাধকের হতো অসীম কল্যাণ।

সর্বদেবীময়ী শ্রীশ্রীমা

(মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা, এপ্রিল, ১৯৯৬ পৃঃ ২০)

সৎসঙ্গ

বিশিষ্ট মহাপুরুষ ও বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গে

- বিশিষ্ট মহাত্মাদের বক্তব্য
- স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
- শ্রীরামঠাকুর
- শ্রীসীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ
- পরমহংস যোগানন্দ
- স্বামী দয়ানন্দ
- শ্রীবালানন্দ মহারাজ
- শুক্ল সন্ন্যাসী শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়
- শ্রীমোহনানন্দ মহারাজ
- মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ
- দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু
- মহাত্মা গান্ধী
- ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
- নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর
- প্রঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
- প্রঃ ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
- ননীবাবু (পুরনো ভক্ত)

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে মহাত্মাদের উক্তি

১) যে সঙ্গ নিয়েছ তা ছাড়বে না, মা ত সাধিকা নন, উনি নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী

২) যেমন সমস্ত নদী সাগরে গিয়ে মিলে, তেমনি বিশ্বের সব ভাবধারা মাতে এসে মিলিত হয়েছে।

শ্রীত্রিবেনীপুরীজী (খান্নাবাবা)

৩) মা জলন্ত অগ্নি, যে উনার সংস্পর্শে আসবে সে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

শ্রীরামবাবা

৪) ভারতের সবচেয়ে পূর্ণ বিকসিত পুষ্প।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

৫) যাঁকে প্রণাম করা উচিত, আমি তাকেই প্রণাম করি।

শ্রীরামঠাকুর

৬) মা সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম।

স্বামী শরণানন্দ মহারাজ (প্রজ্ঞাচক্ষু)

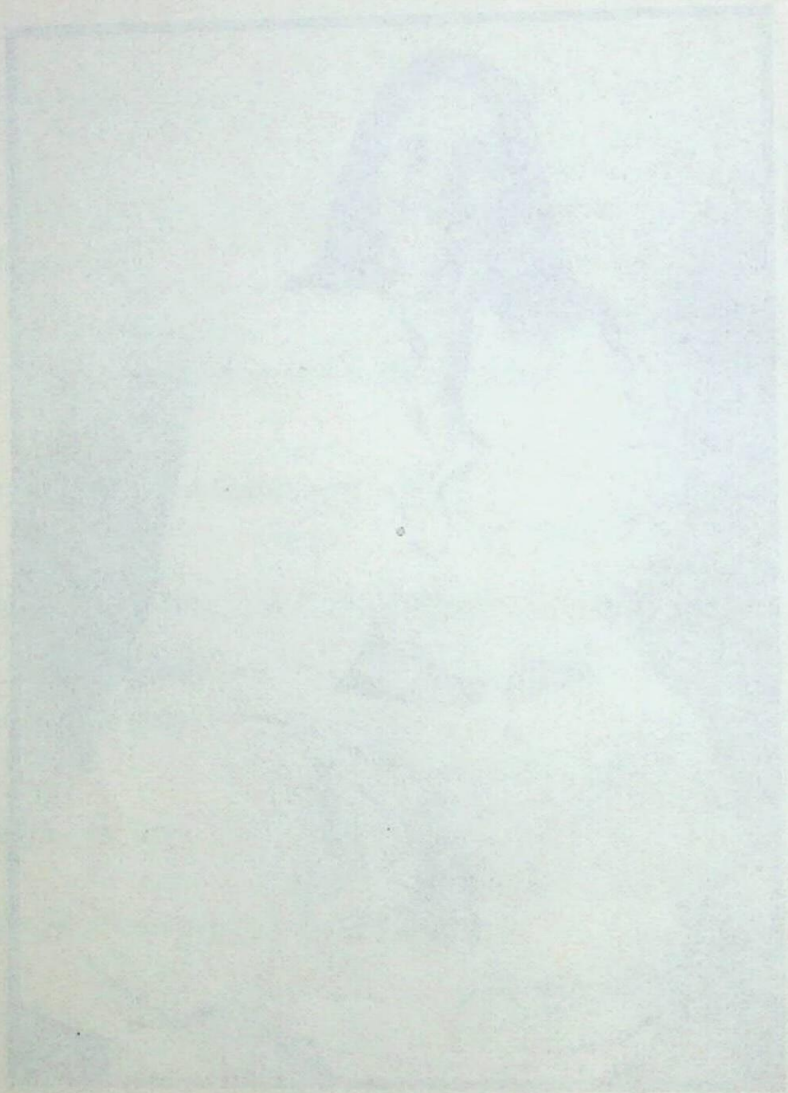
৭) চিদানন্দের চিদাভাস।

শ্রীশংকর ভারতী মহারাজ

৮) আনন্দময়ী মা সর্বদা সচিদানন্দ সাগরে বিরাজ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন





যোগীরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে যখন বিশুদ্ধানন্দজী কাশীতেই ছিলেন তখন মা গোদৌলিয়ায় পাঁড়ে ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। আচার্য্যদেবের বিশেষ প্রচেষ্টায় এই সময় উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো সম্ভব হয়। ১৪ই অগ্রহায়ণ বিকালবেলা এক বাসে করিয়া মাকে ধর্ম্মশালা হইতে মালদহিয়া স্থিত শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। মার সঙ্গে ভোলানাথজী, ভাইজী, গুরুপ্রিয়াদিদি ছাড়াও প্রায় পনেরজন মাতৃভক্ত পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

আশ্রমের বিজ্ঞানমন্দিরের দোতলায় পূর্বদিকের বারান্দায় মা ও তাঁহার সঙ্গীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করা হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ছিল যে মা নিজের সঙ্গীদের লইয়া উপরে যাওয়ার পূর্বেই স্বীয় গুরুদেবকে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ দিবেন। কিন্তু মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বরঞ্চ একটু আগেই বিজ্ঞান মন্দিরের দোতলায় পৌঁছিয়া যান। মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে পৃথক পৃথক আসন বিছান ছিল। অন্যদের জন্য কম্বল বিছান ছিল।

মা পৌঁছিয়াই বলিলেন, "মেয়ে তো বাপের কাছে এল।" এই কথা বলিয়া মা বিশুদ্ধানন্দজীর দিকে অগ্রসর হইলে তিনি নিজের আরামকুর্শী ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া মাকে বলিলেন, "মা, এতদিন পর বাবাকে মনে পড়ল?"

এই কথার উত্তরে মা বলিলেন, "বাবা, তুমিও তো ডাক নাই।"

মার জন্য যে আসন রাখা ছিল তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর সামনে সে আসনে না বসিয়া মাটিতে বসিলেন। অন্যরা নিজের নিজের আসনে বসিলেন। সমস্ত বারান্দা মাতৃভক্ত ও আশ্রমবাটীতে ভরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর বিশুদ্ধনন্দজীর দৃষ্টি মার কাশ্মীরীয় ভক্তগণের উপর পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা, এরা সব কে, কোথা থেকে এসেছে?

তখন মা বলিলেন, "বাবা, এরা সব একই জায়গা থেকে এসেছে, যেখান থেকে সকলে আসে।"

বিশুদ্ধানন্দজী মার পরিহাস বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, সব তো একই জায়গা থেকে আসে, কিন্তু বাইরে এলেই আলাদা হয়ে যায়।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আলাদা, কিন্তু একের মধ্যে আলাদা-আলাদা।"

তারপর মা ভাইজীকে বলিলেন, "তোরা না কি সব দেখতে চেয়েছিলি, বাবাকে বল না।"

আচার্য্যদেব এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় গুরুদেবকে বলিলেন, "বাবা, আপনার জীবন-চরিত পড়িয়া জ্যোতিষবাবুর (ভাইজী) জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে যে সূর্য্যবিজ্ঞান জিনিষটা কি এবং কেমন করে হয়?"

বিশুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "সূর্য্যবিজ্ঞান যোগবিভূতি নহে। যারা বুঝে না তারা মনে করে যে এটাও এক প্রকার যোগবিভূতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যবিজ্ঞানের সঙ্গে যোগের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি করা যায়। যোগবিভূতি দ্বারাও করা যায়। অর্থাৎ বাহ্যজগতের যে কোন পদার্থ উভয় প্রকারেই সৃষ্ট হতে পারে। তথাপি উভয়ে অনেক প্রভেদ। সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির সময় সূর্য্যের বিভিন্ন রশ্মিকে লেন্স দ্বারা আকর্ষণ করে একত্র করা হয় ইপ্সিত দ্রব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সূর্য্যের অপর নাম সবিতা অর্থাৎ প্রসবিতা। সূর্য্য হতেই এই দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। সূর্য্য দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে। সূর্য্য বিজ্ঞানবিদ্ সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করে সূর্য্যরশ্মিগুলোর স্বরূপ জেনে নেন এবং সেগুলোর পরস্পর মিলন প্রণালী শিখে ইচ্ছানুরূপ বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। এতে যোগীর আত্মিকশক্তির উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টির সময় উপাদান বাইরে থেকে নেওয়া হয় না। সে সময় উপাদান আত্মস্বরূপ থেকে নিতে হয়। সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির সময় উপাদান সূর্য্যরশ্মি থেকে নেওয়া হয়। এই প্রকার চন্দ্রবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির সময় উপাদান চন্দ্র থেকে, বায়ুবিজ্ঞানে বায়ু থেকে এবং শব্দবিজ্ঞানে শব্দ থেকে নেওয়া হয়। অপর পক্ষে ইচ্ছাশক্তি থেকে যে সৃষ্টি হয় তাতে কোন উপাদান নেওয়া হয় না। সেক্ষেত্রে আত্মাই নিমিত্ত, আত্মাই উপাদান। সে কারণে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টি বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, কারণ ইহা আত্মার পক্ষে ক্ষতিকারক। যদিও সে ক্ষতির পূরণ সম্ভব তবু যোগীর ইষ্টপ্রাপ্তিতে বাধা উৎপন্ন হয়। কিন্তু সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন প্রকার আত্মিক হানির সম্ভাবনা থাকে না।"

এই বলিয়া বিশুদ্ধানন্দজী নিজের পুরাতন শিষ্য এবং অবসরপ্রাপ্ত সাব

জজ দুর্গাকান্তরায়কে ভিতর হইতে লেন্স আনিতে বলিলেন। স্বীয় গুরুস্থান জ্ঞানগঞ্জ হইতে আনীত সেই লেন্স সর্বদা তাঁহার পকেটেই থাকিত এবং নিত্য প্রয়োজনে লাগিত। তিনি লেন্সের সাহায্যে বিভিন্ন রশ্মি আকর্ষণ করিয়া প্রথমে নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। পরে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের ফুল, কর্পূর, কেশর ইত্যাদিও প্রস্তুত করিলেন। ফুল হইতে একটি স্ফটিকও প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। স্ফটিকটির প্রস্তুতপ্রক্রিয়া কালে কয়েকবার জ্যোতিষবাবুর হাতে দিয়া দেখাইয়াছিলেন—উহা ক্রমশঃ নরমভাব হইতে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। জ্যোতিষবাবু সূর্য্যরশ্মি হইতে ভৌতিক স্থূল বস্তুর উৎপত্তি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মা এইসব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যা করছ তা কিন্তু মেয়ে সব বুঝতে পারছে।"

মার ভক্তরা বলিলেন, 'মা, বল না, বাবা কি করছেন?'

মা উত্তরে বলিলেন, "বললে বাবা আমাকে ডাণ্ডা মারবে।"

বিশুদ্ধানন্দজী তখন বলিলেন, "মা, তোকে দিয়েই তো সব করছি।"

মা বলিলেন, "বাবা, এসব তো প্রকৃতিশক্তির খেলা। এও একপ্রকার মায়ারই খেলা।"

বিশুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "হ্যাঁ, মায়া! সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিই তো মায়াবীর মায়া। এতে আর সন্দেহ কি?"

মা বলিলেন, "এক মায়ার ধাক্কায় সব লোক মোহিত হয়ে আছে, আবার মায়ার উপর মায়া কেন? মায়া দূর করে দাও।"

মা পরে আচার্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবাকে ধর, এঁর কাছে পরম বস্তু রাখা আছে। উনি আবরণের উপর আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখছেন।

তারপর বিশুদ্ধানন্দজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর আবরণ এনো না, সব আবরণ দূর কর। পরম বস্তু খুলে দাও।"

তখন বিশুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "মা, আমি তো দেবার জন্যই এসেছি। দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে হাত বাড়িয়েও রয়েছি। কিন্তু নেয় কে?"

ভাবটা যেন এই প্রকার সে সব মহাবস্তু গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অধিকারী কই? কেননা তিনি কথা প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছেন, বিড়ালের পিঠে ত হাতীর

বোঝা চাপান যায় না। যোগপথে অনধিকারীকে মাত্র কৃপাবলে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার চেষ্টা তাহার প্রতি অনুগ্রহ নয়, নিগ্রহই।

মা এই সব শুনিয়াও আচার্য্যদেবকে বলিলেন, "বাবা তোমাদের এসব খেলা দেখিয়ে ভুলিয় রেখেছেন, তোমরা ভুলে থেকো না। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে আদায় করে নাও।"

মা নিশ্চয়ই আচার্য্যদেবকে উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়াই স্বীয় গুরুদেবের প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে উৎসাহিত করিলেন।

এরপর বিশুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "মা, পিতার ঘরে এসেছ, কিছু খেতে হবে।"

মা বলিলেন, "এরা সব মেয়েকে খাইয়ে এনেছে।" বিশুদ্ধানন্দীজী বলিলেন, "তবে কি কিছুই খাবে না?"

মা বলিলেন, "কেন খাবো না? ছোট মেয়ে কতবারই খায়। কিন্তু এ মেয়ের একটা অভ্যাস.নিজে হাতে সে কিছু খায় না। খাইয়ে দিতে হবে।"

তখন বিশুদ্ধানন্দজী একটা পাত্রে ফলমিষ্টি নিয়া মাকে খাওয়াইবার জন্য দাঁড়াইলেন। মাও দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উভয়েই ঐ পাত্র হইতে মিষ্টি তুলিয়া পরস্পরের মুখে দিলেন। কিন্তু কে প্রথমে দিলেন বুঝা গেল না। সম্ভবতঃ দুইজনেই একসঙ্গে পরস্পরকে খাওয়াইলেন।

ইতিপূর্বে বিশুদ্ধানন্দজীকে অসময়ে ঐভাবে কাহারও হাত হইতে কিছু মুখে দিতে কেহ দেখে নাই।

আচার্য্যদেব শেষ জীবন পর্যন্ত প্রায়ই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আক্ষেপ করিতেন এই বলিয়া যে সেই সময় কোন ক্যামেরা সঙ্গে থাকিলে সেই অপরূপ দৃশ্য ফটোতে তুলিয়া রাখা যাইত।

বিশুদ্ধানন্দজী ও মার জাগতিক দৃষ্টিতে সেই প্রথম ও অন্তিম মিলন এই অপূর্ব ভাবেই হয়।

মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা
এপ্রিল, ১৯৯৬

শ্রীশ্রীরামঠাকুর

একদিন শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়কে নিয়া প্রাণকুমার বাবু প্রভৃতি অনেকে মার আশ্রম আসিয়াছিলেন। রামঠাকুর মহাশয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিলেন। মা ও হাত জোড় করিয়াই রহিলেন। কিছু সময় থাকিয়া তাহারা চলিয়া গেলেন। রামঠাকুর মহাশয় মা'র পিতার বয়সী। তিনি মাকে প্রণাম করিলেন অথচ মার তাহাকে প্রণাম করিলেন না। ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তরা কেহ কেহ তাহার নিকট গিয়া অনুযোগ করিলেন। প্রাণকুমার বাবু তাহা শুনিয়া মাকে জানাইলেন। মা হাসিয়া বলিলেন—তুমি তাদের বলিও যে ঠাকুর মহাশয়ের পা সর্ব্বদাই আমার মাথায় আছে। আমি যে সাধারণভাবে প্রণাম করিতে পারি না, কি করিব? শরীর যেন কেমন হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া কাহারও কিছু বলিবার রহিল না। এদিকে রামঠাকুর মহাশয়কে তার একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আনন্দময়ী মা আপনার মেয়ের বয়সী, আপনি কেন তাঁর পায়ের ধূলা লইলেন? সকলের তো নেন না? তিনি বলিলেন যিনি আমার প্রণাম পাইবার যোগ্য তাহাকেই প্রণাম করিয়াছি। রামঠাকুর মহাশয় অনেককেই বলিতেন—তোমরা রমনা গিয়া মাকে দর্শন কর।"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ২য়, ১৩ অধ্যায়

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ

দয়াময়ী মাগো,

মা আমার, তুই তো সব সেজে লীলা করছিস্। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুইই ছিলি, তোর ইচ্ছা হল বহু হবো জন্মাবো, তুইই মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূত হলি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সাজলি, কোটি কোটি প্রণাম তোকে আর তোর লীলাকে। আজ বিজয়লীলাকে প্রণাম করছি। তোর সীতারাম।

((এই চিঠিটা শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ হৃষিকেশ থাকাকালীন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে লেখেন—মা তখন কনখলে।)

* * *

"এই সেই ভবতারিণী মা, দক্ষিণেশ্বরের সাক্ষাৎ ভৈরবী, ঠাকুর যাকে পূজা করেছেন"

—শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ

মাতৃদর্শন—ডাঃ দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* * *

এর মধ্যে এলো মাতা আনন্দময়ী তিরোধান সংবাদ। একটা দিন বাবা ঝিম মেরে রইলেন। কিছুই ভাল লাগছে না। তারপর ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হলেন। বললেন—মা গেছেন সাজঘরে—সাজ পাল্টাতে। ফিরে এলেন বলে। বাংলাতেই আসবেন—ব্রাহ্মণ ঘরেই আসবেন। এবার আরো শক্তি নিয়ে আসবেন—ভারতের কিরূপ হয় দেখবি।

বাবা অর্থে শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ

দেবযান পত্রিকা-পঞ্চত্রিশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

পরমহংস যোগানন্দ (যোগদা সৎসঙ্গ)

ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শন লাভ আমার আগে কখনো ঘটেনি। আনন্দময়ী মা সমাধিস্থ থাকাকালীন আমি নিকটস্থ একটি শিষ্যাকে কতকগুলি প্রশ্ন করলুম— শিষ্যাটি বললেন "আনন্দময়ী মা ভারতের বহুস্থানেই ভ্রমণ করেন। ওনার খুব স্বাচ্ছন্দ দেখবার জন্য আমাদের একটি দল ওর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ করে। কেউ যদি না ওকে খেতে দেয় তো খানই না। খাবার সামনে দিলে তা পর্য্যন্ত ছোন না। শেষ পর্য্যন্ত উনি যদি দেহত্যাগ করে বসেন, সেই ভয়ে ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেই। দিনের পর দিন সমাধি ভঙ্গের পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলুম আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন, মা বললেন—বাবা, বলার কি আছে। কিছুই নেই। আমার চৈতন্য কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয়নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে বাবা আমি সেই এক ছিলুম। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও আমি সেই, নারীত্বে পৌঁছে তখনও আমি সেই। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম তারা যখন এই দেহটার বিয়ে দিতে চাইলো তখনও "আমি সেই" আর বাবা আপনার সামনে "আমি একই" আছি। আর এই অনন্তের কোলে আমার ঘারে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের আমি সেই একই থাকবো।

যোগীকথামৃত, পৃঃ ৫২৭

*　　　*　　　*

রাঁচী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আর একবার মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যোগানন্দজীর। শ্রীরামপুর রেল স্টেশনে ভক্তদের সঙ্গে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারতা মা আনন্দময়ীকে দেখেই এগিয়ে এলেন যোগানন্দজী। মা বললেন, "বাবা, হিমালয়ের দিকে যাচ্ছি। জন কয়েক মিলে সেখানে একটি আশ্রম তৈরি করেছে।"

মা আনন্দময়ী ট্রেনে উঠলেন। গন্তব্যস্থল উত্তর ভারত। যোগানন্দজী অবাক হয়ে দেখলেন জগজ্জননী মা আনন্দময়ীকে, কি ভীড়ের মধ্যে ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে, কোনো অবস্থায়ই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনো লক্ষ্যচ্যুত নয়। অনন্তের মধ্যে এখনো সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়—দেখো, 'আমি চিরকাল সেই একই আছি।'

মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা, জানুয়ারী ১৯৮৮

স্বামী দয়ানন্দ

একদিন ভারতধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দকে মাতাজীর নিকট দেখিয়াছিলাম। স্বামী দয়ানন্দের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে সাক্ষাৎ ভগবতীই মাতা আনন্দময়ীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। মাতা আনন্দময়ীর সাথে বাক্যালাপের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মা আপনি কে? মাতা আনন্দময়ী উত্তর দিলেন "আমি আর কি বলবো? আপনি যাহা বুঝিয়াছেন আমি তাহাই"। পুনরায় স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—যখন আপনি সমাধিতে থাকেন তখন উহা সবিকল্প সমাধি না নির্বিকল্প সমাধি, সে সম্বন্ধে বলুন। মা বললেন ইহার বিচার আমি কিরূপে করিব আমি যে সমাধিতে থাকি তাহা তুমি দেখিয়াছ এবং উহা তোমারই কথা—সুতরাং তোমারই বিচারের বিষয় সমাধি কি না, কিরূপ সমাধি সেইটা তোমার বিচারের বিষয়, ঐ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব। আমি তো বেশী পড়াশুনা করি নাই, কাজেই সমাধির প্রকার ভেদ জানি না। তবে কেবল এই বলিতে পারি—সর্বদা ঐ এক অবস্থায়ই থাকি সমাধি হওয়া আর সমাধি ছাড়া তোমাদের কথা, আমার কাছে দুই-ই এক। এই স্থিতির নাম তুমিই বল।

সাধু দর্শন ও সৎসঙ্গ (৫ম)
মঃমঃ গোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীবালানন্দ মহারাজ

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেওঘর—সঙ্গেই গিয়াছি। শিষ্যদের মুখে শুনিলাম স্বামীজীর বয়স প্রায় এক শত বৎসর। সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই পরিচিত। খুব বড় আশ্রম; দুইটি মন্দির আছে ও ব্রহ্মচারীরা কয়েকজন আছেন। স্বামীজী একটু দূরে একটি মন্দিরে থাকেন। মন্দিরটির নাম 'ধ্যান-মন্দির'। প্রাণগোপালবাবু মাকে ধ্যানমন্দিরে নিয়া গেলেন। সেখানে স্বামীজীর সহিত মার সাক্ষাৎ হইল। মাকে দেখিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। তিনি কথায় কথায় মাকে বলিলেন, "মা, একবার সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিয়াছিলে, আজ স্থূল শরীরে দর্শন দিতে আসিয়াছ।" রোজই মা প্রাতে ও বৈকালে আশ্রমে যাইতেন। আমরাও সঙ্গে যাইতাম। একদিন স্বামীজীর সহিত মার কথা হইতেছে—মা বলিতেছেন, "এক ছাড়া কিছুই নাই।" স্বামীজী বলিতেছেন, "দুই, তিনিও তাঁহার মায়া।" মা কিছুতেই দুই স্বীকার করিতেছেন না। অনেকক্ষণ কথার পর স্বামীজী মার কথাই স্বীকার করিলেন। মা হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীজী মাকে কোলের কাছে বসাইয়া লিচু খাওয়াইয়া দিলেন। পরদিন আশ্রমে মাকে খাওয়াইলেন, মাকে এক ছড়া রুদ্রাক্ষমালা ও একখানি রক্তবস্ত্র দিলেন। সেখানে কীর্ত্তনে মার খুব ভাব হইল। বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ভাবে নাচিতেছিলেন। মার অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া চাহিয়াছিলেন। মা ঐ ভাব-অবস্থায়ই স্বামীজীর মাথায় হাত দিলেন। পরে ঐ অবস্থায়ই স্বামীজীর হাত ধরিয়া ধ্যান-মন্দিরে গেলেন। সেখানে গিয়া গোপনে কিছু কথা হইল।

মা আনন্দময়ী (ষষ্ঠ) ১৯৭ পৃঃ

শুক্ল সন্ন্যাসী প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাথে শ্রীশ্রীমায়ের কিছু কথোপকথন

মঃমঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল) শুক্ল সন্ন্যাসী নামেও পরিচিত। উনিই প্রথম ঢাকা শাহবাগে শ্রীশ্রীমার কুলবধূ অবস্থায় তাঁর উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করেন এবং প্রকাশ করেন। আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ১৯২৬ সনে দেওঘরে গুরু সিদ্ধসাধক বালানন্দজীর আশ্রমে। প্রাণগোপালবাবুকে শ্রীশ্রীমা তার তৎকালীন সাধন অবস্থা সম্বন্ধে নিজ হস্তাক্ষরে যে চিঠি দেন, তা তার অমূল্য নিদর্শন হয়ে আছে। দেওঘরে শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তাঁর কিছু কথপোকথন "মহাজন সংবাদ" থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

দেওঘরে যখন তিনি প্রথম আসেন আমাদের বাড়িতে ১৯২৬ সালে মে মাসে, তখন একদিন সন্ধ্যায় পিতৃদেব কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন: "শরীরের এই আক্ষেপ-বিক্ষেপ হয় কেন?" অর্থাৎ কীর্তনাদি শুনলে বা নাম জপ করতে করতে দেহে পুলক-অশ্রু-কম্প বা গড়াগড়ি দেওয়া, এসব হওয়ার কারণ কী? উত্তরে আনন্দময়ী মা পিতৃদেবকে বলেন: "যতদিন দেহের অধ্যাস থাকে ততদিন এগুলি দেখা দেয়।" পিতৃদেব তখন তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন: "তোমার এসব হয় কেন?" তার উত্তরে তিনি বলেন: "এখনও সে অবস্থা প্রকাশ পায়নি।" পিতৃদেব চিরদিনই শান্ত সুস্থির ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও কীর্ত্তনাদি শুনতে শুনতে তাঁরও ভাববিহ্বলতা দেখা দিত, দুই চোখের অবিরাম অশ্রু ধারায় বুক ভেসে যেতে দেখেছি। তিনি তাই তখন মা আনন্দময়ীকে বলেন: "তুমি কীর্ত্তন শুনবার সময় কেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বস না যে শরীরে কোনো আক্ষেপ-বিক্ষেপ ঘটতে দেব না, এক শান্ত গভীর আনন্দে নিজের মধ্যে নিজে ডুবে যাব, অর্থাৎ বাইরে ভাবকে ছড়িয়ে যেতে দেব না, অন্তরে সংহত করে রাখব, কারণ তাতে যে আনন্দ আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে আস্বাদন করা যায়।" পিতৃদেবের এই কথার বা ইঙ্গিতের তিনি তখন আর কোনও জবাব দিলেন না।

পরদিনই আশ্রমে কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে ঁগুরুমহারাজের সামনে। পিতৃদেবের ইচ্ছা গুরুমহারাজকে দেখাবেন কীর্ত্তনে আনন্দময়ী মার কেন ভাবাবেশ হয়। সেদিন আনন্দময়ী মা আগাগোড়া শান্ত হয়ে বসে কীর্ত্তন শুনে গেলেন। পিতৃদেব ভাবলেন পূর্বদিন সন্ধ্যায় তিনি যে সংকল্প নিয়ে শান্ত হয়ে বসার কথা বলেছিলেন হয়তো তাই মনে রেখে তিনি আজ এত শান্ত সংযত হয়ে রইলেন। কিন্তু কীর্ত্তন ভাঙার ঠিক পূর্বে যখন হরিনামের মাতন হরিবোল ধ্বনি শুরু করল কীর্ত্তনীয়ার দল, তখনই সব ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙে গেল, তিনি যেন লাফ দিয়া পড়লেন কীর্ত্তন অঙ্গনের মাঝখানে, কোথায় গেল দীর্ঘ অবগুণ্ঠন, কোথায় গেল দেহের আবেষ্টন, কেশপাশের বন্ধন। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঝড়ের হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো দেহ গড়াগড়ি দিতে লাগল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল। সেই ভাবের বিভোর অবস্থাতেই তিনি একসময় ঁগুরুমহারাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে যেত তাঁর জটাজূট স্পর্শ করলেন। ঁগুরুমহারাজ অমনি তাঁর হাতখানি ধরে ফেললেন ও তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর 'ধ্যান-কুটীরে'। সঙ্গে শুধু গেলেন তাঁর স্বামী রমণীবাবু অর্থাৎ পরবর্তীকালে যিনি ভোলানাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই ধ্যান-কুটীরে অনেকক্ষণ তাঁদের নিভৃতে কথাবার্তা হয়। এসবের কিছু বিবরণী গুরুপ্রিয়া দেবীর "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে।

এর প্রায় দুবছর পরে পিতৃদেবের সঙ্গে আনন্দময়ী মার দেখা হয় কাশীতে। সেখানে তখন আমার বড়দাদা তপোগোপাল, পোস্টাল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট। তাঁর সেই কোয়ার্টারে আনন্দময়ী মা পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথমেই বলেন: "হ্যাঁ বাবা! তুমি যে আমাকে বলেছিলে সংকল্প নিতে, তা আমি সংকল্প নিই কখন? আমার এ ভাব তো আমাকে জানিয়ে শুনিয়ে আসে না যে আমি আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে সাবধান হব, সংকল্প নেব।" পিতৃদেব শুনে অবাক হন যে সেই কবে কোন্ কথাপ্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলেছিলেন, তা আনন্দময়ী মা ঠিক মনে করে রেখেছেন এতদিন পরেও। পিতৃদেব তখন হেসে তাঁকে উত্তরে বলেন: "ও যখন তোমার আপনিই আসে, তখন আপনিই যাবে, সংকল্প আর নিতে হবে না।" পরবর্তী জীবনে ধীরে ধীরে এক শান্ত আনন্দের মহিমা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, বাইরের

আলোড়ন-বিলোড়ন ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গিয়েছিল, পিতৃদেবের কথাই সত্য হয়েছিল।

পিতৃদেবের দেহত্যাগের বছর দুই আগে একবার আনন্দময়ী মা এলেন। পিতৃদেবের তখনই আশি বছর চলছে। বললেন তাঁকে: "আশিতেই যেন আসি। এ ফল এখন পেকে টুসটুস করছে—কোন্‌দিন খসে যাবে। সে সময় কাছে এসে দাঁড়িয়ো।" এর পরই ১৯৫১ সালে পিতৃদেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তাঁর সেবা-পরিচর্যায় নিরত আছি। একদিন সারারাত পিতৃদেব ঘুমোতে পারলেন না, ভোরের দিকে আমাকে বললেন: "তোমারও আজ সারারাত ঘুম হল না, যাও গৌরের (আমার মেজদাদার) কাছ থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক কিছু ওষুধ এনে আমায় খাইয়ে দিয়ে নিজে একটু শুয়ে নাও।" আশ্রমের ঠিক বিপরীত দিকেই আমাদের বাড়ি। রাস্তার পার হয়ে বাড়িতে গিয়ে ওষুধ নিচ্ছি, এমন সময় দেখলাম অন্ধকারে একটা মোটর এসে থামল সামনের গেটে। আমরা দু-ভাই-ই বলে উঠলাম: 'এত ভোরে আবার কে এল?' আমরা ভাবলাম হয়তো আত্মীয় স্বজন ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে দেখতে চলে এসেছে।

ওষুধ নিয়ে হ্যারিকেন হাতে চলে আসছি, অন্ধকারে গাড়ির সামনে আসতেই দেখি তার মধ্যে আনন্দময়ী মা বসে আছেন। আমি বললাম: "তুমি? কোত্থেকে?" উত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "বাবা কোথায়? কেমন আছে?" বলেই গাড়ি থেকে নেমে আমার পিছন পিছন চলে এলেন। অন্ধকার ঘরে মশারির মধ্যে পিতৃদেব তখন বসে আছেন। আমি মশারি তুলে আলোটি ধরে তাঁকে বললাম: "দেখুন কে এসেছে!" তিনি আনন্দময়ী মাকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত, হতচকিত। বললেন: "এসে গিয়েছ? নাও, এবার কোলে তুলে নাও।" আনন্দময়ী মা 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে দু পা পিছিয়ে গেলেন, তারপর কাছে এগিয়ে এসে পিতৃদেবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন: "দেখো গোবিন! এর আগে বাবাকে কোনোদিন স্পর্শ করা হয়নি, তিনি এত স্থির ধীর গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন যে তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার কথাও ভাবা যেত না, ছোঁওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু সেদিন কী আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গেল, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার, ঘরে আর কেউ ছিল না তুমি ছাড়া, তাই বাবাকে

ঐভাবে স্পর্শ করা হয়ে গেল।" পিতাপুত্রীর সেই শেষ আশ্চর্য মিলনের আমি নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম।

পরের দিন সকালে আবার তিনি এলেন! তখন লোক জানাজানি হয়ে গিয়েছে, কে একজন জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে তাঁকে। সেইটি পরেই তিনি পিতৃদেবের ঘরে ঢুকলেন, বললেন: "বাবা, বাবা! তোমার জন্যে আমি গলায় করে এই মালা নিয়ে এসেছি পরাব বলে।" এই বলে মালাও পরিয়ে দিলেন তাঁকে, যা কোনোদিন কেউ সাহস করেনি তাঁকে পরাতে, কারণ বাইরের কোন পূজা-সম্মান-সমাদর তিনি গ্রহণ করতেন না কখনও। পিতৃদেব তাঁকে হেসে বললেন: 'জানো তো, পাণ্ডবদের নিয়ে তিনি এলেন শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের শিয়রের পাশে, 'জ্ঞানের শেষ প্রদীপটি নিভে যাচ্ছে, যা জানবার জেনে নাও এঁর কাছে' এই বলে। ভীষ্ম বললেন, 'এ তো তোমার ছল, এসেছ তো আমাকে শেষ লগ্নে দর্শন দিয়ে উদ্ধার করতে। তুমি থাকতে আমি এদের কী উপদেশ দেব?' তেমনি তো তুমিও এসেছ আজ শেষ দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে।" শুনে আনন্দময়ী মা 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে সলজ্জে থেমে গেলেন।

মহাজন সংবাদ, পৃঃ ১৬৪-১৬৬
মঃ মঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীমোহনানন্দজী মহারাজ

আনন্দময়ী মা দেওঘরে এসেছেন। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী আনন্দময়ী মাকে বললেন, 'মা'র বুঝি এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়লো? গুরুপ্রিয়া দেবী, মোহনানন্দজী, ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে রয়েছেন। মোহনানন্দজী মায়ের গলায় ফুলের মালা পরালেন। তিনি ফল, ফুল নিবেদন করে আনন্দময়ী মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

মোহনানন্দজীর সঙ্গে মায়ের আলোচনা শুরু হল। মোহনানন্দজী প্রশ্ন করলেন, প্রাণবায়ু স্থির করার উপায় কি? মা উত্তরে বললেন, প্রাণবায়ুর তরঙ্গ আছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মন, মন্ত্র, স্বর এক করতে হয়। মা জানালেন, সবই এক। এক বিরাট মহান ভাব, সব বললেও এক বলা হয় না। সকলেই এক পথের যাত্রী।

মোহনানন্দজী প্রশ্ন করলেন, তিনি অনন্ত। তাঁর পথে যাত্রা করলে যাত্রাও ত অনন্তই হবে। তবে কি এ যাত্রার শেষ নেই? মা বললেন, অন্তের মধ্যে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে অন্ত, সবই যে আছে। মা জানালেন, আসল কথা নিজেকে জানা। অনন্ত গতিরূপে আমিই এক। আবার আমিই বহুরূপে প্রকাশ। জাগতিক যে সব তোমরা বহুরূপে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু যেখানে রূপ অরূপের দ্বন্দ্ব নেই, সেইটা চাওয়াই জীবের স্বভাব।

মা মোহনানন্দজীকে বললেন—তুমি ত বাবা সাধক। সাধকরা দেখ এই এক লক্ষ্যের জন্য এই মনের দ্বারাই একত্বে পৌঁছবার যাত্রী হয়। এক গুরুর কৃপায়ই খণ্ডত্ব ও অখণ্ডত্ব, সীমা ও অসীম, অনন্তগতি, অনন্ত রাস্তা, অনন্ত ভাব। সবই নির্দ্বন্দ্ব রূপে তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে। সৃষ্টি স্থিতির মধ্যে যতক্ষণ থাকবে এসব কথা। আর আসাটাও মঙ্গলকর। এই সব বিচারে না আসলে নির্দ্বন্দ্বরূপে বাক নির্বাকাতীত হবে।

শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ

প্রঃ দ্রষ্টা ও সাক্ষীতে ভেদ কি?

উঃ দ্রষ্টা কাকে বলে?

প্রঃ যে দেখে সেই দ্রষ্টা। যে দৃশ্য দর্শন করে সেই দ্রষ্টা।

উঃ আর সাক্ষী?

প্রঃ তাও.ত মা জানি না।

উঃ তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কি প্রকারে? যে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কি প্রশ্ন হয়?

প্রঃ শাস্ত্রে সাক্ষীর কথা পড়িয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উঃ দুই-ই এক।

প্রঃ তবে পৃথক নাম কেন?

উঃ 'তুমি'—'আমি' পৃথক নাম কেন? ব্যবহারে ওরূপ হয়। মূল এক।

প্রঃ গীতায় আছে—'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—মন কি করিয়া আত্মায় স্থাপন করা যায়? তার সাধনা কি?

উঃ তুমি যে কাল দ্রষ্টার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ওটা কি তোমার উপলব্ধির রেখা?

প্রঃ হ্যাঁ, মা।

উঃ তবে আজ এরূপ গোলমেলে প্রশ্ন করিতেছ কেন? মনকে আত্মায় স্থাপন না করিলে কি মনের নিরোধ হয়? কাল যে অবস্থার কথা বলিতেছিলে তখন কি তোমার মন পৃথক থাকে?

প্রঃ না, মা।

উঃ ঐ অবস্থা তোমার কি প্রকারে হয়? তুমি কি চেষ্টা কর? না আপনিই হয়?

প্রঃ আমি আসনে বসিয়া উপদেশ ক্রমে কাজ করিতেই হঠাৎ ওরূপ হইয়া যায়।

উঃ উহাই তোমার পক্ষে মনকে আত্মসংস্থ করার সাধনা।

প্রঃ মা নির্বিকল্প সমাধির সার্থকতা কি?

উঃ নির্বিকল্প মানে কি? বিকল্পশূন্য—অর্থাৎ মনের ক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থা।

প্রঃ আর সমাধি?

উঃ মন লয় হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যাওয়া। ইহাই তো নির্বিকল্প সমাধি।

প্রঃ হ্যাঁ, মা। তখন মনের নিরোধ হইয়া যায়।

উঃ তোমার জিজ্ঞাসা কি?

প্রঃ এই প্রকার সমাধিতে লাভ কি? ইহার সার্থকতা কি?

উঃ তুমি যে সাধনা কর তার উদ্দেশ্য কি?

প্রঃ উদ্দেশ্য—সত্য বস্তু লাভ।

উঃ উহাই সত্য বস্তু।

প্রঃ চৈতন্যদেব ভক্ত ছিলেন, কি পূর্ণ ছিলেন বা অংশ ছিলেন?

উঃ মহাপুরুষদের কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে। সে কিন্তু এসব বিষয়ে কিছুই বলে না।

প্রঃ দেহের মধ্যে মনের স্থান কোথায়?

উঃ সুখ দুঃখ হাহুতাশটা কোথায় লাগে?

প্রঃ মনে।

মা। কোন স্থানে বোধ কর?

প্রঃ তা তো জানি না।

মা। (আমাকে) কোথায়?

আমি। হৃদয়ে।

প্রঃ হৃদয় কোথায়।

মা। দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে তবু বোধ থাকে, হাত, পা ইত্যাদি। কিন্তু গলা কাটিলে কি থাকে?

প্রঃ না।

মা। তাহ'লে উপরে কোন স্থানে হবে—কি বল?

প্রঃ হ্যাঁ, মা। কিন্তু ঠিক ঠিক কোন জায়গায়?

মা। তুমি কি কাজ করিতে চাও?

প্রঃ হ্যাঁ।

মা। আবার এসো।

প্রঃ মন অথবা প্রাণ ইহাদের একটাকে সংযত করিয়া অপরটিকে আয়ত্ত করা যায় কি না?

মা। উভয় এক জিনিষ। মন ছাড়িয়া প্রাণ নাই, প্রাণ ছাড়িয়াও মন নাই।

প্রঃ প্রাণায়াম তো মন ছাড়াও করা যায়।

মা। তা কি কখনও হয়?

প্রঃ মা, আপনি বলছেন—এক সময়ে সকলেই তাকে পাবে। তবে আর চেষ্টার দরকার কি?

মা। বোধ থাকলে আর দরকার কোথায়? কিন্তু বোধ ত' নাই—তাই চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পার না। তবে এ চেষ্টাও কিন্তু সেই করায়।

প্রঃ এ এক সময় কখন আসিবে?

মা। সময়ের কি ঠিক আছে? যে কোন মুহূর্তে সে "সময়" আসতে পারে।

প্রঃ আমি যদি অন্নপূর্ণার বীজ জপ করি ও সঙ্গে সঙ্গে রামরূপ ধ্যান করি—তাহলে কি দোষ আছে? গুরু যদি এমন বীজ দেন যাহা আমার প্রাণের প্রিয় রূপ হইতে পৃথক তাহা হইলে ঐ বীজ জপ ও ইষ্টরূপের ধ্যান সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে পারে কিনা।

মা। তুমি কি একসঙ্গে দুই কাজ পার?

প্রঃ শাস্ত্র বলেন—মন্ত্র ও দেবতা এক করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মা। করিয়া দেখ না কেন?

প্রঃ ঐ ক্ষেত্রে দর্শন কাহার হইবে? অন্নপূর্ণার না রামের?

মা। উভয়ের কাহারও নহে, অথচ উভয়েরই। তখন এমন এক জিনিস দেখা যাইবে—যাহা উভয়েই আছে। অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখা গেলেও তাহা রামমূর্ত্তি বা অন্য কিছু হইয়া যাইবে—ইচ্ছাবশতঃ রামমূর্ত্তিতেও তাই।

প্রঃ তুলসীদাস বৃন্দাবন যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি তোমার এরূপ দেখিব না। তুমি বংশী ছাড়, ধনুঃ ধর। আমার কাছে রামরূপে প্রকাশিত হও।" তুলসীদাস জ্ঞানী লোক—তিনি এরূপ প্রার্থনা কেন করিলেন?

মা। ইহা একাগ্রতা দেখাইবার জন্য মাত্র। নতুবা তিনি জানিতেন—সবরূপই তাঁরই রূপ। তা যদি না হইত তবে তিনি কি প্রকারে বলিলেন

তোমার এ রূপ দেখিব না। এ তুমি কে? এ সেই যার সব রূপ, বংশীধারী রূপ, ধনুধারী রূপ উভয়ই। তা—সেই স্বরূপ—তিনি দেখেছিলেন। তাই তাঁর প্রার্থনায় কৃষ্ণ রামরূপে আবির্ভূত হলেন। মূল এক রূপকে না দেখিলে তা হতে পারত না। তুমি যদি অন্নপূর্ণা ও রামকে এক ভাবতে পার, তা হলে তোমারই ঐ রূপ হবে।

প্রঃ মনের চাঞ্চল্য যায় কিসে?

উঃ একস্থানে চুপ করে বসে থাকতে চেষ্টা কর। ভাণ্ডে জল যেমন নড়ে চড়ে—ভাণ্ডটা স্থির করিয়া রাখিলে কিছুকাল পরে জল আপনিই শান্ত হয়। সেইরূপ দীর্ঘকাল দেহ স্থির করিয়া রাখিলে মন আপনিই স্থির হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উপদেশ ও প্রশ্নোত্তর

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র ও শ্রীশ্রীমা—

আমরা যখন প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলাম তখন শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের সহিতই প্রসাদ পাইলেন।

আহারান্তে দক্ষিণেশ্বরের কর্ত্তৃপক্ষ নেতাজীকে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থান দেখাইতে লাগিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিল। এমন সময় দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রীমা নহবত ঘর হইতে নামিয়া পঞ্চবটীর দিকে আসিতেছেন। পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাঁধান জায়গাটায় মায়ের বসিবার আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নেতাজীও মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের সম্মুখে বসিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। মা, বা সুভাষবাবু কেহই কথা বলিলেন না। কোন কথা হইতেছে না দেখিয়া শ্রীযুক্ত ভূপতিবাবু মায়ের নিকট সুভাষ বাবুর পরিচয় দিলেন। মা সুভায বাবুকে বলিলেন, ‘‘আহ্‌মেদাবাদে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।’’

সুভাষবাবু। আপনি আহ্‌মেদাবাদে গিয়াছিলেন না কি?

মা। হাঁ।

আবার সকলেই নীরব। আমি ভূপতি বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম যে তিনি সুভাষ কোন প্রশ্ন করিতে বলুন। ভূপতিবাবু সুভাষ বাবুকে বলিলেন, ‘‘আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে মাকে বলুন। ’’ সুভাষবাবু বলিলেন যে তাঁহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার নাই। কাজেই আবার সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। শ্রীমতী ভ্রমর আমার নিকট বসিয়াছিল, তাহার পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়িতে আমাকেই অগত্যা একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইল। আমি বলিলাম, ‘‘মা, দেশের সেবা করিয়া কি ভাগবানকে লাভ করা যায়?’’

মা। (সুভাষ বাবুকে) বাবা, তুমি বলত ভগবানকে লাভ করা যায় কি না।

সুভাষ বাবু। আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি? (সকলের হাস্য)।

মা। (হাসিয়া) তুমি কিসের খোঁজ রাখ?

সুভাষ বাবু। প্রশ্ন ত আমাকে করা হয় নাই।

মা। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। তোমার হইয়া ইহারা প্রশ্ন করিয়াছে। (আমাকে) তাই নয় কি?

আমি। হাঁ, মা।

মা। (সুভাষ বাবুকে) এখন বল। আচ্ছা, তুমি দেশের সেবা কর কেন? উহাতে কি লাভ? কি লাভ আছে তাহা যদি বল, তবে উহা শুনিয়া সকলেই দেশের সেবা করিবে। বিনা লাভে ত কেউ কিছু করে না। তুমি কত ভাল ভাল লেক্‌চার দাও, কিছু বল।

সুভাষ বাবু (হাসিয়া) আমি ত লেক্‌চার দিতে এখানে আসি নাই। (সকলের হাস্য) দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পাই, তাই দেশের সেবা করি।

মা। এই আনন্দ কি নিত্য?

সুভাষ বাবু। এই নিত্য কথাটির অর্থ একটু শক্ত।

মা। যাহা সকল সময় আছে তাহাই নিত্য। স্বভাবের কাজেই নিত্য আনন্দ। ভাল ভাবে সেবা করিলে এই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তাহা কি, বাবা, করিতেছ?

সুভাষ বাবু। আমি বলিতে আসি নাই, শুনিতে আসিয়াছি।

মা। শুধু শুনিতে আসিয়াছ। যাহা বলিব তাহা শুনিবে? যাহা করিতে বলিব তাহা করিবে?

সুভাষ বাবু। তাহা বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

মা। দেখ, আমরা যাহা কিছু জাগতিক কর্ম্ম করি উহা শুধু অভাবের কর্ম্ম। অবশ্য অভাব দূর হইলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক কাজ হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় উহা শুধু অভাবই জাগাইয়া রাখে। মনে কর কোন একটা বিষয়ে অভাব বোধ করিলে এবং উহা দূর করিবার জন্য কর্ম্ম আরম্ভ করিলে। চেষ্টার ফলে হয়ত অভাব দূর হইল এবং আনন্দও পাইলে। কিন্তু ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই আবার অন্য অভাব জাগিয়া উঠিল। সেইজন্য বলি যে, জাগতিক কর্ম্ম হইতেছে অভাবের

কর্ম্ম। স্বভাবের কর্ম্ম করিলে নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বলিলে যে দেশের সেবা করিয়া তুমি আনন্দ পাও। দেশের সেবাত ভালই। তোমার প্রাণটা মহান্, খুব বড়, তুমি উহাকে আরও বড় করিতে চেষ্টা কর। দেশের সেবা খণ্ড ভাবে করিলে উহাও অভাবের কাজ হইবে। উহাতে যে আনন্দ পাইবে তাহাও খণ্ড আনন্দ। কিন্তু সকলে চায় অখণ্ড আনন্দ, যে আনন্দের শেষ নাই। স্বভাবের কাজ করিলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দে স্থিত হইয়া যায়। তবে বলিতে পার, "আমি একা আনন্দে স্থিত হইয়া কি করিব? জগৎ দেখিতেছি নিরানন্দময়।" ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তাহা হইলে উহা অপরকেও দেওয়া যায়।

সুভাষবাবু। স্বভাবের কর্ম্ম কি?

মা। কর্ম্ম মাত্রই অভাবের কর্ম্ম, কারণ অভাব বোধ না হইলে কর্ম্ম হয় না। তবে যে কর্ম্ম করিলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ পায় তাহাকেই স্বভাবের কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। স্বভাব কি না যাহা আমার নিত্য আছে। তোমার ভিতর অখণ্ড আনন্দ আছে বলিয়াই ত অখণ্ড চাহিতেছ? যাহা তোমার মধ্যে নাই তাহা কখনও চাহিতে পারিবে না।

সুভাষবাবু। সকলের স্বভাব কি এক?

মা। হাঁ, সকলেই ত আমরা অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছি। জগতে এক বইত দুই নাই। লোকে যে অন্যের সেবা করে উহাও ত নিজের জন্য। সকলে এক বলিয়াই ত একে অন্যের সেবা করিয়া আনন্দ পায়।

সুভাষবাবু। আপনি সকলেরই এক স্বভাব বলিতেছেন, কিন্তু গীতায় আছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

মা। স্বধর্ম্ম কি? স্বভাবের ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য সাধনা। (নিজেকে দেখাইয়া) এই শরীরটার কোন শিক্ষা নাই, তাই ইহা আবোল তাবোল বলে। স্বধন পাওয়াকেই আমি সাধনা বলি। গীতার কথা ত সত্যই। স্বভাবের ধর্ম্ম লাভ করাইত জীবের উদ্দেশ্য।

সুভাষবাবু। কিন্তু ইহাও সত্য যে লোকের স্বভাব বিভিন্ন। কাহার কি কর্ম্ম জানা নাই।

মা। হাঁ, সংস্কার ভিন্ন হইলেও ধর্ম্ম এক। সত্য এক।

সুভাষবাবু। উহা ত নিজের দিক হইতে ঠিক করা যায় না।

মা। কাজ আরম্ভ করিয়া কাজ করিতে থাকিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। তখন যাহার যে সংস্কার তাহা ফুটিয়া উঠে। দেখ না, ছেলেরা লেখাপড়া করিতে চায় না। কিন্তু কিছুদিন জোর করিয়া উহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক এক বিষয়ে এক এক জন ভাল করিতে থাকে। কেহ হয়ত ইংরাজিতে ভাল হইল, কেহ হয়ত অঙ্কে ভাল হইল। সেইরূপ লোকে কাজ আরম্ভ করিলে কিছুদিন পর দেখা যায় যে, তাহারা তাহাদের সংস্কার অনুসারে কাজ করিতেছে।

সুভাষবাবু। পথ ত বলিতেছেন না।

মা। (হাসিয়া) কর্ম্ম করিতে হয়। সঙ্কল্প করিতে হয় যে, "আমি পড়ব।"

আমি। মা, তোমার উত্তর অস্পষ্ট থাকিয়াই যাইতেছে। তুমি বলিতেছিলে যে সকলেই অখণ্ড আনন্দ চায়। সুভাষবাবু বলিতেছেন যে তিনি দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পান। তাহা হইলে কি বুঝিব যে দেশের সেবা করিয়া গেলেও অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যাইবে? ভগবান্ লাভ হইবে?

মা। অখণ্ড ভাবে সেবা করা চাই! বাস্তব সেবা যাহাতে হয় তাহাই করিতে হয়।

সুভাষবাবু। সেবারও ত একটা পথ আছে? পথেরই ত যত গণ্ডগোল।

মা। পথেরই যত গণ্ডগোল, পথেই যত পরিশ্রম। তবে যেমন পড়িবার দৃঢ় সঙ্কল্প হইলে বিদ্যা লাভ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে আমার পাইতে হইবেই এইভাবে এইরূপ দৃঢ়ভাব আসিলে পথও পাওয়া যায়।

সুভাষবাবু। অন্ধকারে হাঁটিলে পথ পাওয়া কঠিন।

মা। হাঁ, কিন্তু অন্ধকারেই হাঁটিতে হয়। বিশ্বাসকে তোমরা অন্ধ বল না? এই অন্ধ বিশ্বাস লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হয়। পরে সব বুঝিতে পারা যায়। ছেলেমেয়েদিগকে যখন প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর তখন কি তাহারা কিছু বুঝে? কিন্তু পড়িতে পড়িতেই জ্ঞান হয়।

সুভাষবাবু। তবে পথ জানা থাকিলে শীঘ্র হয়।

বার বার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সুভাষবাবুর সহিত মায়ের কথাবার্তা জমিয়া উঠিল না। আমাদের সকলের প্রাণেই একটা অতৃপ্ত ভাব রহিয়া গেল। মায়ের সহিত সুভাষবাবুকে নির্জ্জনে দেখা করান যায় কিনা সে বিষয়ে যতীশবাবু চেষ্টা করিবেন বলিয়া বলিলেন।

কথাগুলি মা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে ছোট্ট একটি বালিকার মত বলিয়া গেলেন। এগুলি কত মধুর শুনাইল তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

সুভাষবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একটু পরে মাকে পঞ্চবটী হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ (৩য় ও ৪র্থ) পৃঃ ২১-২৭
শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীশ্রীমা—

মহাত্মাজী মা'র কথা শুনেছিলেন—নেহেরুজী ও যমুনালাল বাজাজের মুখে। ১৯৪২ খৃঃ যমুনা লালজীর দেহান্তের অব্যবহিত পরে, মা গৌ-পুরীতে গিয়েছিলেন। তখন মহাত্মাজী মাকে ওয়ার্দ্ধায় আমন্ত্রণ জানান। মা বলে পাঠালেন যে নিমন্ত্রণের কি আছে? এই ছোট মেয়েটার যদি খেয়াল হয় তবে কেহ না বললেও বাপুজীর কাছে চলে যাবে.....বিনোবা ভাবেজীও মাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু তাকেও মা বললেন 'পিতাজী এই শরীরটার মাথার ঠিক নেই। যা হয়ে যায়। বিনোবাজীকে বিদায় দেবার পর মা হঠাৎ কমল নয়নকে (যমুনালাল বাজাজের পুত্র) বললেন চল এখনই সেবাগ্রাম যাই। এখান হতেই চল ভিতরে আর যাব না। যথাসময়ে মা সেবাগ্রামে উপস্থিত হলেন। ....

মহাত্মাজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল দিন দুই মা তার আশ্রমে থাকেন। সেজন্য তিনি অনেক অনুনয় বিনয় ও যুক্তি তর্কও করেছিলেন। দুইজনের মধ্যে নিম্নধৃত কথোপকথনের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মার খেয়াল কত দৃঢ় ও অননমিত হয়। অথচ মায়ের সাবলীল স্বতস্ফূর্ত উত্তরগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে—অনুপম লালিত্য ও মাধুর্য্য অসাধারণ রসবোধ ও প্রত্যুতপন্যমতিত্ব। মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বে কাছেও মার খেয়ালই বজায় রইল।

মহাত্মাজীই প্রথম কথা বললেন, "যমুনালালকে তোমার কাছে কে পাঠিয়েছিল জানো? আমিই পাঠিয়েছিলাম। যমুনালাল আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলেছে যে, আমার নিকট হতেও যে শান্তি সে পায়নি, আমি যে শান্তি তাকে দিতে পারিনি, সেই শান্তি সে তোমার নিকট পেয়েছে। সে তোমাকে পেয়ে কি রকম পাগল হয়েছিল তা তুমি জানো?"

মা হেসে মাথাটি নাড়লেন মাত্র। মহাত্মাজী আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "আমাকে তোমার কথা প্রথম কে জানায় জানো? কমলা নেহেরু। সে-ই আমাকে বিশেষ করে বলেছিল, আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি।" উপস্থিত সকলকে মহাত্মাজী বললেন, "কমলা ইহাকে গুরুর মত মানতেন।" মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "পিতাজী! আমি কারও গুরুটুরু

নয়। আমি তো ছোট বাচ্চি।" মহাত্মাজী হেসে বললেন, "আচ্ছা। আচ্ছা!"

মহাত্মাজীর বিশেষ আগ্রহ, মা অন্ততঃ দু'দিন তাঁর আশ্রমে থাকেন। মা হাসতে হাসতে বললেন, "পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটার মাথাটা কিছু খারাপ। সব সময়ে সব কথা রাখতে পারে না। কী করব, পিতাজী? তোমার স্বভাবই তো মেয়েটা পেয়েছে?" সকলে মার শুনে হেসে উঠলেন।

মহাত্মাজী মা'কে রাখবার জন্য অনেক ভাবের কথাবার্তা বলেও যখন আশা পেলেন না তখন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ উপস্থিত সকলকে দেখিয়ে বললেন, "এরা যে সকলেই হাসবে। বলবে, কোথা হতে একজন পাগলী মেয়ে এনেছে, তাকেই বুঝিয়ে রাখতে পারল না, আর চীনদেশের সেনাপতিকে (চিয়াং কাইশেক) কিভাবে বুঝাবে? সকলেই আমাকে তখন উপহাসই করবে।"

মা হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ তো, আমার বাবাকে নিয়ে লোকে যদি একটু আনন্দ করে, হাসে, হাসুক না। আর আমার বাবা তো এ-সব কথা গ্রাহ্যই করে না। বাবার এ-সবে কিছুই এসে যায় না।"

মহাত্মাজী। "আমি তো অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলছ ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলে ফেলেছি।" তারপর অনেক কথাবার্তা হলো। মায়ের যাওয়া স্থগিত করা অত্যন্ত কঠিন দেখে মহাত্মাজী বললেন, "তুমি বড় ধোঁকাবাজ মেয়ে। আমাকে ধোঁকা দিয়ে ভোলাতে পারবে না।" মা হেসে জবাব দিলেন, "ধোঁকাকে তো ধোঁকা দেওয়াই ভাল। কি পিতাজী, ঠিক না?"

আবার যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলো। মা হাসতে হাসতে বললেন, "আমার বাবা আমার কথায় নিশ্চয়ই রাজী হবে। আমাকে কাল নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।"

মহাত্মাজী। "আমাকে এমন বাবা পাওনি যে এত সহজেই বুঝিয়ে চলে যাবে। আমি এত শীঘ্র রাজি হবার পাত্র নয়।"

মা হাসতে হাসতে আবার বলছেন, "বাবা ছোট্ট মেয়েটার কথা শুনবেই।"

অবশেষে মহাত্মাজী যখন বুঝতে পারলেন যে, মা'কে রাখা যাবে না, তখন তিনি কমলনয়নের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "যাওয়ার ব্যবস্থা কি?"

সেবাগ্রামে খেয়াল-লীলার শেষ পর্ব অতীব মনোরম। মা আস্তে আস্তে বললেন, "পিতাজীর কথা কত লোকে শোনে। আর এই পাগল মেয়েটা এত করে বলা সত্ত্বেও কথা রাখলো না। পিতাজী নারাজ হবে না তো?"

মহাত্মাজী মৃদু হেসে বললেন, "তোমার তাতে কিছু পরোয়া আছে কি?"

মা হেসে উত্তর করলেন, "আবার হয়তো খেয়াল হলে নিজেই এসে পিতাজীর ঘরে ঢুকে পরবো। কি বল, পিতাজী? মাথাটা যখন এরকম?"

মহাত্মাজী ধীরে ধীরে বলছেন, "হাঁ, চোর-ডাকু এরকমই করে। দেরাদুন হতে একজন এরূপ এসেছে। কি আর করি?"

আনন্দের সঙ্গে হাসতে হাসতে মা বললেন, "বাঃ, পিতাজী চোর-ডাকাত নাম দিয়ে দিল। 'চোরী করনেওয়ালী' এইতো বেশ ভাল নাম।" এই বলে আরও জোরে হাসতে লাগলেন। অর্ধস্ফুটস্বরে মহাত্মাজী সাড়া দিয়ে বললেন, "এমন 'চোরি করনেওয়ালী' কোথায় মিলে?"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (৭ম খণ্ড)

নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর

নৃত্যশিল্পীর অনেকদিনের ইচ্ছে মাকে একবার স্বচক্ষে দেখার। ইচ্ছে পা ছুয়ে প্রণাম করার। আনন্দময়ী কাউকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেন না।

কিন্তু সেদিন বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যশিল্পীর আবেদন ছিল আন্তরিক—'মা গো, আমার বড় ইচ্ছা ঐ চরণ স্পর্শ করতে, কিন্তু আপনি তো দেবেন না।

শিল্পীর দিকে তাকালেন আনন্দময়ী। আশপাশের প্রকৃতির ভরপুর আলো হাসি তখন তাঁরও মুখে।

সেদিন উদয়শংকরের ইচ্ছাপূরণ করে ছিলেন আনন্দময়ী। তাঁর পা ছুয়ে প্রণাম করলেন। তারপর কথায় কথায় এলো নাচের কথা। আনন্দময়ীর সামনে উদয়শংকর ছাড়াও রয়েছেন অমলাশংকর, সিমকী প্রভাত গাঙ্গুলী, সতী দেবী আরো অনেকে। আনন্দময়ী বললেন, 'নাচটা কি? না তরঙ্গ। যেমন বীজ বুনলে তার মধ্যে একটা স্পন্দন বা তরঙ্গ না থাকলে বীজ ফেটে গাছ হতে পারে না, যেমন জলাশয়ে বাতাস না লাগলে ঢেউ হয় না, সেই রকম সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়, সবতাতেই আছে তরঙ্গ। এ তরঙ্গই নাচ। যেমন রান্নাঘরে গেলে, এই বাসনটা এই রকম ভাবে রাখলে, তারপর রান্না করতেও এইভাবে বসলে, হাতটা এইভাবে নাড়লে রান্না হল—এই সবই নাচ। নৃত্যেরই তালে তালে সব কিছু। .....আবার দেখো নাচের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও সম্বন্ধ আছে। যদি ঐ ভাবটা নিয়ে কাজ করা যায় তবে সহায়তা হবেই।.....

সবাই হতবাক। বেশি উদয়শংকর। শিল্পীর এতদিনের নৃত্যভাবনা, শিল্পভাবনার প্রাণভোমরাটিকে এক যোগিনী কেমন সহজ কয়েকটি শব্দের ডানায় উড়িয়ে দিলেন। তাঁর দু'চোখে ঘনিয়ে এলো কৃতজ্ঞতা। প্রমাণ পেলেন তাঁর শিল্প সাধনার সেই অমূল্য চাবিকাঠিটি রয়েছে এক যোগিনীর আঁচলে।

উদয়শংকর তখন প্রভাত গাঙ্গুলীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'দেখ এতদিন যে আমরা এই বিদ্যার আলোচনা করে আসছি, আজ মার মুখে শুনলে তো তার ব্যাখ্যা। মা তো আর নৃত্যকলা-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। কিন্তু দেখ, কি আশ্চর্য! কি সুন্দর সঠিক ব্যাখ্যা করলেন। নৃত্যকলার এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই....।'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৮ম ভাগ

* * *

সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান

সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান দার্শনিক জিজ্ঞাসাবাদের টানে, রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝেই চলে আসতেন মায়ের আশ্রমে। শুরু হয়ে যেত প্রশ্নোত্তর পর্ব। মাতৃ সৎসঙ্গ। একবার এমনই এক মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণান প্রশ্ন করেছিলেন—মাতাজী, আধ্যাত্মিক জীবনে রুচি ও নিষ্ঠা কীভাবে হতে পারে?

মায়ের উত্তর ছিল যেমন সরল তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ—পিতাজী, অভ্যাস যোগের দ্বারাই এই পথে রুচি ও নিষ্ঠা আসে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম

১৯২৬ সালে গ্রীষ্মকালে দেওঘর যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন রায়বাহাদুর প্রাণ গোপাল মুখার্জ্জীর (ডেপুটি পোঃ মাঃ জেনারেল) আমন্ত্রণে মা তার গুরুদেব বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রমে এক সপ্তাহ ছিলেন। রোজই খুব সুন্দর নাম কীর্ত্তন হোত এবং ঘন্টার পর ঘন্টা উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হোত। এই রকম কীর্ত্তন চলাকালীন একদিন সন্ধ্যাবেলায় মা গভীর ভাবে সমাধিস্থ হলেন এবং হঠাৎই দাঁড়িয়ে উঠে "হরিওঁ" "হরিওঁ" কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করলেন। এত সুমধুর সুরে কীর্ত্তন হচ্ছিল যে তখন মনে হচ্ছিল ইনি কোন মানবী নন—স্বয়ং ভগবতী। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেছেন যে আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছি যে মায়ের চরণ কখনও ভূমি স্পর্শ করে নাই। ইনি স্বয়ং ভগবতী না হয়ে পারেন না। প্রায় আধ ঘন্টা কীর্ত্তন হবার পর ব্রহ্মচারী মহারাজ মাকে তাঁর ধ্যান কুটিরে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে খুবই উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ আলোচিত হয়। ব্রহ্মচারী মহারাজ এতে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আজ দীর্ঘদিন পরেও সেই "হরিওঁ" মধুর ধ্বনি যেন ভুলতে পারছি না।

ভক্তদের দৃষ্টিতে মা ইং পৃঃ ৩৯

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

সহসা মা পূজা প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মণ্ডপে ফিরে এলেন। পিছনের প্রবেশ পথ দিয়ে। অধ্যাপক চক্রবর্তী হাসতে হাসতে বললেন, মা! তুমি তা হলে back door দিয়ে আস! এই প্রশ্নের মধ্যে নির্দোষ হাস্যরস ছিল এবং মায়ের মুখে হাস্য রসাত্মক উত্তরই সকলে আশা করেছিল। এই কথার রঙ্গরস করলে মেয়েও সাধারণত জবাব দিতেন রঙ্গরসের ভাষায় এবং কৌতূকের ভঙ্গীতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো, রঙ্গরসের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, মা দৃঢ়স্বরে 'বাবা'কে বললেন, "পিছনেও থাকি, সামনেও থাকি, ডাইনেও থাকি, বামেও থাকি, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে থাকি, আবার উপরেও থাকি, নীচেও থাকি। মায়ের মুখে যখন এই স্বতঃস্ফূর্ত বাণী ঘোষিত হলো, তখন মায়ের ভাব গভীর, গম্ভীর, তাঁর নয়ন যুগল প্রশান্ত প্রসন্নতা, কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, কিন্তু সুস্পষ্ট ও নিশ্চয়াত্মক।

আনন্দময়ী মা, গঙ্গা-সমীরণ

ননীবাবুর প্রশ্নোত্তরে মা

শেষদিকে রাত্রি ৯টার সময় ননীবাবুর (মায়ের পুরানো ভক্ত) বাসায় মার শুভাগমন হয়। সেদিন কেবল শুনিলাম তাঁহার মুখে ঐ এক কথা—"আমি চন্দ্র, আমি তারা, আমি সূর্য, আমি আকাশ, আমি পবন।" আরও নতুন কথা শুনলাম—নিরহারাজং, নিরাহবাহং অহং নিরাহরা—

প্রশ্ন—"মা, চন্দ্র, তারা গগন পবন সব আহার করিয়া আত্মস্থ করিয়াছ। আবার বল তুমি নিরাহারা? তৃপ্তিরশ্মি, আমি "তৃপ্তি তাই আমি সকলি আত্মস্থ করে আছি, পরে তাই আমি "নিরাহারা" মার মতন মুখেও কিসের আভা?

শ্রাবণের শেষদিকে একদিন রাত্রি ৯টার সময় আমার বাসায় মার শুভাগমন হয়। সেদিন কেবল শুনিলাম তাঁহার মুখে ঐ এক কথা—"আমি চন্দ্র, আমি তারা, আমি সূর্য, আমি আকাশ, আমি পবন।" তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলাম, দেখিতে পাইলাম যেন বৈদিক যুগের সেই ঋষিকন্যা—যিনি হঠাৎ একদিন ধ্যানমগ্ন পিতা ঋষির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাহিলেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহং আদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রায়ী অহমশ্বিনোভা।।

আরও নূতন কথা শুনিলাম—"নিরাহারাহং, নিরাহারাহং, অহং নিরাহারা"—

প্রশ্ন ঃ "মা! তুমি চন্দ্র তারা গগন পবন সব আহার করিয়া আত্মস্থ করিয়াছ, আবার বল তুমি নিরাহারা?"

উত্তর ঃ "তৃপ্তিরস্মি তৃপ্তিরশ্মি"—আমি "তৃপ্তি", তাই আমি সকলই আত্মস্থ করিয়াছি, আর তাই আমি "নিরাহারা"।

গত সোমবারে মা আমার এখানে আসিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন ও অনেক কথা বলিলেন।

প্রশ্ন ঃ "মা! তুমি সেদিন জড়সমাধি কি বলিতেছিলে?"

উত্তর ঃ "জড়সমাধি বলিতে হয় বল, এই সকলই তাহাতে থাকিবে সব একাকার হইবে। কেবল কথা আর ক্রিয়া থাকিবে না।"

প্রশ্ন ঃ "মা! সংসার আমাকে টানে, না আমিই এই সংসার টানিয়া আনিয়াছি?"

উত্তর ঃ "সংসারই টানে। বল তো সংসার কাহার? সেই একেরই টান। পুত্রকন্যার আকর্ষণ, রূপ রস গন্ধের আকর্ষণ সেই একেরই আকর্ষণ।"

প্রশ্ন ঃ "দুই বিপরীত দিকে টান কেন মা? একবার এদিকে, একবার ওদিকে (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দিকে) টান কেন মা? একের টান বলে তো মনে হয় না।"

উত্তর ঃ "দুই দিকে কেন? চারিদিকে খেলাইয়া, শেষে এক টান।"

মাঃ "হাঁ হাঁ, স্মৃতিসারতত্ত্ব, স্মৃতিসারতত্ত্ব, সংসার স্মৃতিসারতত্ত্ব। এই দেখ আমি যাহা ছিলাম, পরে যাহা হইব, আর এখন যাহা আছি, সব স্মৃতিতে ভাসে।"

মার মধুময় বাক্যের প্রতিধ্বনিতে প্রাণ ভরিয়া গেল।

মহাজন সংবাদ পৃঃ ১৭৮
ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

- শ্রীমার সংক্ষিপ্ত জীবনী—ব্রঃ শিবানন্দ
- শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—দিদি গুরুপ্রিয়া
- সাধনলীলা (কিছু কথা)
- সূক্ষ্মদেহীদের সান্নিধ্যে মা
- মায়ের কথা
- নবাব বাড়ীর পূজা
- মাতাজীর দর্শনদান—ম্যালিটা ম্যাসমান

শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আবির্ভাব ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশান্তর্গত) ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬খৃঃ) রাত্রি প্রায় তিন দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্যাকূট নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় ৺বিপিন বিহারী ভট্টাচার্যের ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুলতানপুর নিবাসী ৺রমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিধূমুখীর দ্বিতীয়া কন্যারূপে। নাম নিয়েছিলেন নির্মলাসুন্দরী। হাসি খুশীতে ভরা অপূর্ব দৈহিক ও স্বভাব সৌন্দর্যে ঘেরা এই ক্ষুদ্র মেয়েটিকে ঐ নামে ডেকে সবার তৃপ্তি হত না। তাই পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় তাঁকে ডাকত আরো বিভিন্ন নামে। কেউ বলত খুশীর মা, কেউ আদরিণী, কেউ বা বলত নন্দিনী বা তীর্থবাসিনী বা বিমলা। অনেক পরে আর এক নাম হয়েছিল—মানুষ কালী। কিন্তু সব নামের সেরা নাম ভাইজী (শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায়) প্রদত্ত 'আনন্দময়ী' নামেই তিনি সর্বজন পরিচিতা হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আনন্দ প্রতিমা।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সময় হতেই তাঁকে ঘিরে ফুটে উঠত নানাপ্রকার অলৌকিক রহস্য। সদ্যোজাত শিশু প্রসূতি-গৃহের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের আমগাছ দেখতেন। দেখতেন, বহু দেবদেবী যুক্ত করে শায়িত শিশুকে প্রণতি জানিয়ে যাচ্ছেন। এই জাতীয় অনেক কথাই পরবর্তীকালে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের একাদশ দিবসে শ্রীনন্দন চক্রবর্তী (বিধুমুখী দেবীর দূর সম্পর্কীয় মাতুল) তাঁকে দেখতে এসেছিলেন সেকথা বহুদিন পরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর জননীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মা আবির্ভূত হয়েছিলেন লীলা পুরুষোত্তম হয়ে। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি কুমারী বা গৃহস্থ বধূরূপে কিংবা ভক্তসঙ্গে তাঁর লীলা বৈচিত্র্যে বিশ্ববাসী আশ্চর্য চকিত হয়ে যেতেন। এর কারণ এই ছিল যে, মানুষ যা করে তার ভিত্তি থাকে অহংকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মা দেহধারণ করেও তিনি ছিলেন দেহবোধ শূন্যা। স্ব-স্বরূপে তিনি ছিলেন

নিত্য জাগ্রত। স্বভাবের প্রেরণায়-ই তাঁর লীলাখেলা পরিচালিত হত। শৈশবে পাড়া-পড়শী, আত্মীয় স্বজনকে তিনি মাধুর্য লীলায় বিমোহিত করেছেন। কৈশোরের 'মা আমি বাঁকা হয়েছি' লীলা ভিন্নতর। গৃহস্থ বধূরূপে সেবা যত্নের লীলায় পরিবার-পরিজন ছিল মুগ্ধ।

অনতিকাল মধ্যেই তাঁর লীলা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ধারায় বইতে লাগল। এবার আরম্ভ তাঁর যোগসাধনের যোগিনী লীলা। এই লীলায় মায়ের দেহকে আশ্রয় করে শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় যোগ ও সাধন ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠতে লাগল। এ যেন অপার সমুদ্রের অগণিত লহরী একের পর এক মায়ের দেহের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যেতে লাগল। মায়ের দীক্ষা হ'ল। সে এক বিচিত্র লীলা। নিজে-ই গুরু নিজে-ই শিষ্য, নিজ মুখেই মন্ত্রোচ্চারণ নিজ কর্ণেই শ্রবণ, গ্রহণ। এক শ্রাবণী পূর্ণিমাতে সর্বদেবদেবীময়ী মায়ের দেহ হ'তেই আবির্ভূত হতে লাগলেন দেবদেবী আবার মায়ের দেহে-ই ঘটল তাঁদের নিমিলন। সে লীলায় বিস্ময় ও বৈভবের পরাকাষ্ঠা!

ক্রমে মা নিজেকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ভক্ত-জনগণ মধ্যে। জীবন মধ্যে আরম্ভ হ'ল আর এক অধ্যায়। ইতিমধ্যে বার বৎসর দশ মাস বয়সে মায়ের বিবাহ। স্বামী ঢাকা আটপাড়া নিবাসী শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী। সে লীলাও কি কম বিস্ময়কর। বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী রমণীমোহন মাকে মা বলেই ডাকতেন এবং মা-ও তাঁকে বাৎসল্য স্নেহে ভোলানাথ নামে-ই সম্বোধন করতেন। তিনি মাতৃনির্দেশে জীবনের আদ্যোপান্তই হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক পথের পথিক।

যাহোক্ মায়ের নবীন লীলায় ভোলানাথ তো ছিলেন-ই, ক্রমে গুরুপ্রিয়া দিদি (আদরিণী দেবী) ও জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) আবির্ভূত হলেন মায়ের লীলাসঙ্গী হয়ে। প্রথমে বাজিতপুর, শাহবাগ, ও ঢাকায় কিছুদিন চলল মায়ের ভাবসমাধি ও যোগ সমাধির লীলা। বিভিন্ন পরিবেশে তিনি পুনঃপুনঃ সমাধিস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। ক্রমে তা রূপান্তরিত হ'ল সহজ-সমাধিতে। এই সময় হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া মায়ের শরীরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হ'তে লাগল। কখনো বাইবেলের সুরে বাইবেলের প্রার্থনা মন্ত্র

কখনো সুস্পষ্ট উচ্চারণে কোরাণের মন্ত্রে নামাজ পাঠ, কখনো বা প্রাচীন ফার্সী ভাষায় জেন্দাবেস্তার মন্ত্র প্রস্ফুটিত হতে লাগল।

এর পরেই একদিন মা বিশ্বজনীন লীলায় অবতীর্ণ হলেন। মা অনুভব করলেন,—"বিশ্বের প্রতিটি লোক, প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষ-লতা, কীটপতঙ্গ, ধূলি, মাটি, জল, এমন কি দেবতা বিগ্রহ-ও" মাকে আকর্ষণ করছে। শুধু স্থলেই নয় সূক্ষ্মেও সেই আকর্ষণ গ্রহ-গ্রহান্তরে। সেই দুর্নিবার আকর্ষণেই মা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ভারতের আনাচে-কানাচে, গ্রামে গঞ্জে, সহরে বন্দরে, দেশে-বিদেশে, স্থলে-সূক্ষ্মে ঘূর্ণিবাত্যার মত-ই। এ লীলা চলেছে দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল ধরে। এই পরিভ্রমণের ফলে মার শরীরকে কেন্দ্র করে দেশ বিদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মন্দির, শত শত আশ্রম, জাগ্রত হয়েছে অগণিত লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থলী, দেশবিদেশ প্লাবিত হয়ে গেছে ধর্মের প্লাবনে। মাতৃ-দর্শনে, মাতৃস্পর্শে, মাতৃ-উপদেশ ও বাণী শ্রবণ করে অগণিত নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-কিশোর-কিশোরী, সাধু-সন্ন্যাসী নবজীবন লাভে ধন্য হয়েছে। মা ছিলেন দুঃস্থের বন্ধু, অগতির গতি, শোকার্তের সান্ত্বনা, অসহায়ের সহায়, বিশ্বজনার করুণাকাতর জননী। মা বলতেন,—"যাদের কেউ নাই, তাদের-ই এ শরীরটার বিশেষ প্রয়োজন।" মায়ের জীবন-লীলায় ইহা আক্ষরিক সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

এইভাবে সুদীর্ঘ সাতাশি বৎসরকার অতিবাহিত করে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট উত্তর প্রদেশের দেরাদুন সহরে বিশ্বজননী মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। এর ঠিক কয়েকদিন পূর্বেই জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য মায়ের অসুস্থতার সংবাদে ব্যস্ত হয়ে মাতৃচরণে উপস্থিত হয়েছিলেন মায়ের আরো দীর্ঘ জীবন কামনা করে। মা তাঁর সেই প্রার্থনার উত্তরে বলেছিলেন,—"পিতাজী! অপ্রকট্। অপ্রকট্ খাঁচ রহা হায়।' সেই অপ্রকটের আকর্ষণেই মা অপ্রকট হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়লেন। পরে শিবতীর্থ কনখলে গঙ্গাতটে তাঁকে স্থূল সমাধিস্থ করা হয় ২৯শে আগষ্ট তারিখে। কিন্তু মা আজও বিদ্যমান, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোনো কোনো ভাগ্যবান আজও প্রায়ই পাচ্ছেন।

ব্রঃ শিবানন্দজী
'কল্যাণ বাণী'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

যিনি স্বরূপতঃ মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ও পূর্ণানন্দরূপে স্বধামে নিত্য বিরাজমান থাকিয়াও সংসার-পথে ক্লান্ত কাতর পথিককে জ্যোর্তিময় চিরশান্তি-ধামের সন্ধান দিবার জন্য করুণাবশতঃ ধরাতলে মানবদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানময় খণ্ড ভাবধারার মধ্য দিয়া কি প্রকারে মহাভাবে প্রবেশ করিতে হয় ও কি প্রকারে চরমে অবিরাম নৃত্যশীল ভাব-তরঙ্গের পশ্চাতে ভাবাতীত চিরশান্তিময় চিন্ময় স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করা যায়, তাহা আপনি আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শরণাগত বৎসল পরমারাধ্যা শ্রীআনন্দময়ী মায়ের লীলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু লিখিলাম, কারণ মনে হইত এইসব ঘটনা, লীলা-কাহিনী, কয়েক বৎসর পর হয়ত কিছু মনে থাকিবে না।

বাঙলা ১৩৩২ সনের পৌষ মাসে (ইং ১৯২৫ ডিসেম্বর) মার সঙ্গে প্রথম দেখা। যেদিন বাবা (শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখার্জী, উত্তরকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) মাকে দেখিয়া আসিয়া খবর দিলেন তাহার পর দিনই আমার মনটা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল মাকে দেখিতে যাইব। কিন্তু বাবাকে কিছু বলি নাই। কাজেই তিনি সন্ধ্যাবেলা একাই চলিয়া গেলেন। যখন বাবার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, আমার বেশ মনে আছে, রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি খুব কাঁদিলাম। কি আশ্চর্য্য, যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, তাঁহাকে দেখিতে পারিলাম না বলিয়া কি কান্না! আজও সে কথা ভাবিলে অবাক হই। তবে এখন বুঝিতেছি কেন তখন না দেখিয়াই কাঁদিয়াছিলাম, কিসের আকর্ষণ ছিল।

পরদিন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করিয়া মার দর্শনে শাহবাগে গেলাম। গিয়া মাকে দেখিয়াই কত পরিচিত তার মত কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা আর কি বুঝাইব—মাথা যেন তাঁর চরণে আপনিই লুটাইয়া পড়ে। মা'র মাথায় বেশ বড় ঘোমটা ছিল, বড় লাল চওড়া-পাড়ের শাড়ী পরা, বড় সিন্দুরের ফোঁটা কপালে। মুখখানায়

অসাধারণ জ্যোতি মাথা, চোখ দুটি লাল, ছল ছল করিতেছে, ভাবে যেন বিভোর। কথা বড়ই জড়াল, অস্পষ্ট—শুনিলাম তিন বৎসর মৌন থাকিবার পর অল্পদিন মাত্র কথা বলিয়াছেন। শেষে দেখিয়াছি ঠিক সে জন্যও নহে। একটু সময় চুপ করিয়া থাকিলেই মা'র সমস্ত শরীর এমন কি জিহ্বাও আড়ষ্ট হইয়া যাইত। দেখিতেছি ভাবে এত ভরপুর যে চোখও ভাল খুলিতে পারিতেছেন না। আমি ত এইপ্রকার ভাব আর কখনও চক্ষে দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, আর কেমন মনে হইতেছে যাহা চাহিতেছিলাম আজ যেন তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। কিছুক্ষণ দুই চারিটি কি কথা হইল ঠিক মনে নাই। কখন যে 'আপনি' সম্বোধন গিয়া 'তুমি' হইয়া গিয়াছে ও গায়ের কাছে লাগিয়া বসিয়াছি কিছুই খেয়াল নাই। মা দুই চারিটি কথা বলিয়াই হঠাৎ বলিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" এই বলিয়া হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কথা বলিতে বলিতে ভাবটা আবার কেমন জমিয়া আসিল। বলিলেন, "তুমি বস, আমি একটু আসি।" আমি অমনি বলিলাম, "তা কি হয়, আমি আসিলাম তোমাকে দেখিতে, তুমি এখন যাইতে পারিবে না।" আমি ভাবিয়াছিলাম মা বুঝি উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু দেখি তা ত নয়, মা ঐখানেই আমার কোলের কাছে মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। আমি রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পড়িয়াছিলাম, তাই ভাবিলাম এই বুঝি সমাধি। আমি চোখ বুজিয়া মার শরীর স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর মা উঠিয়া বসিলেন। শরীর যেন অসাড়। ভাবিলাম একটু স্থির ভাব আনিবার জন্য মানুষকে কত সাধনা করিতে হয়, কিন্তু ইহার দেখিতেছি সর্বদাই সেই ভাব লাগিয়াই আছে। উঠিয়া আবার অতি অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতে বলিতে ক্রমে কথা কিছু স্পষ্ট হইয়া আসিল। অনেকক্ষণ কথা হইল।

নেশা লাগিয়াছে। পরদিন আবার গেলাম, দেখিলাম, কথা শুনিলাম, চলিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আর প্রাণ টিকে না। রোজই যখনই হয় একবার করিয়া মার কাছে যাই, সেই সময় টুকুর প্রতীক্ষায় সারা দিন রাত বসিয়া থাকি, ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইতেছে, মধ্যে মধ্যে গিয়া মাকে সাহায্য করি, পরিবেশনে সাহায্য করি। আমাকে

পাইয়া মা খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "ভগা তোমাকে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন এই শরীর দিয়া সব কাজগুলি যেন ঠিকমত হয় না, তাই সাহায্য করিবার জন্য ভগা তোমাকে নিয়া আসিয়াছেন।"

মা পাতের প্রসাদ কাহাকেও দিতেন না। পায়ের ধূলাও দিতেন না—দূর হইতে সকলে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিতেন, মাও হাত জোড় করিতেন। কেহ পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিলে অমনি মাও তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিতেন। এই ভয়ে আর কেহ পায়ে হাত দিতেন না। আমি রোজই মা'র জন্য একটি মালা ও কিছু ফুল নিয়া আসিতাম। মা যখন চুপ করিয়া বসিতেন, কীর্তন আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমি মালাটি মা'র গলায় দিয়া দিতাম এবং ফুল হাতে দিতাম। সেদিনও আনিয়াছি। দেখি মা ভাবে বিভোর হইয়া কীর্তনের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। মালা দেওয়া হয় নাই। তাই মনটা কেমন খারাপ হইল। আমি প্রথম হইতে মা'র শরীর রক্ষা করিবার জন্য ভাবের সময় পুরুষদের ভিড়ের মধ্যেও মা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম কিন্তু সে দিন মা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া কেমন যেন একা একা কীর্তনের মধ্যে যাইতে একটু লজ্জা করিতে লাগিল—যাইতে পারিলাম না। কোণের ঘরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মা'র দিকে চাহিয়া রহিলাম, মাকে যে মালা দিতে পারিলাম না এই দুঃখ মনে মনেই মাকে জানাইতে লাগিলাম। দেখিলাম মা কতক্ষণ ঘুরিয়া সুরিয়া প্রতিদিনের মত বাতাসা লুটাইয়া দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছেন। মনে হইল মা শীঘ্র উঠিবেন না—কত চেষ্টা করিয়া যে তাঁহাকে উঠাইতে হয় তা জানা ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ ধীরে ধীরে মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বে আর কখনও এইরূপ দেখি নাই, কাজেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম মা টলিতে টলিতে কোণের ঘরে দিকে, আমার দিকে আসিতেছেন। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝাইতে পারিব না, বুকের ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠিল, মুহূর্তের মধ্যেই মা টলিতে টলিতে আমার কোলের উপর আসিয়া পড়িয়া গেলেন, আমিও তাঁকে জড়াইয়া নিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘরে আর কেহ নাই, অন্ধকার ঘর, আমার মনের বাসনা বুঝিতে পারিয়াই মা এই ঘরে এইভাবে উঠিয়া আসিলন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

তখন মনে কেমন জোর হইল, আমি কোন বিধিনিষেধ মানিলাম না। অন্ধকারে মা'র গলায় মালা দিয়া ফুলগুলি পায় ঢালিয়া দিলাম, ভাবিলাম আর ত কেহ দেখিবে না। কিন্তু ফুল পায় দিতেই মা কেমন শক্ত হইয়া কোল হইতে গড়াইয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে কেমন একটা আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, মুখ লাল, হাত পা যেন উল্টাইয়া যাইতেছে, একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতেছেন। ভোলানাথ অবস্থা দেখিয়া দৌড়িয়া ঐ ঘরে আসিলেন। যে কয়জন কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন সকলেই আলো নিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। মা'র পায় ও কাপড়ে নানা রংএর ফুল বাতির আলোতে পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল মা'র পায় আমি ফুল দিয়াছি, তাই মা'র এই অবস্থা। মারও অস্পষ্ট শব্দ ক্রমে একটু ফুটিল, বাহির হইল, "ফুল দিয়াছে আমি যাই।" এই বলিয়া যে কি ভাব করিতে লাগিলেন তাহা দেখিলেই ভয় হয়। ভোলানাথ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যাইও না।" সকলে মৃদু মৃদু ভাবে বলিলেন, "অন্যায়ই হইয়াছে, যখন নিষেধ।" তাহাও আমার কানে গেল। মা'র এই অবস্থা, আমার অবস্থা বুঝাইব এমন ভাষা আমার নাই। আমি যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছি, আঙুল নাড়িবারও শক্তি হারাইয়াছি। লজ্জা, দুঃখ ও ভয় আমার ঐ অবস্থা করিয়া দিয়াছে। আমার মনে হইতেছিল পৃথিবী ফাঁক হইলে ভিতরে চলিয়া যাইতাম। কি করিয়া আর লোকের কাছে মুখ দেখাইব। বাবাই বা কি বলিবেন। সকলেই জানে মা আমাকে একটু বিশেষ অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আজ আম কি করিয়া বসিলাম, লোকে কি মনে করিবে? মা'র আদেশ অমান্য করিলাম। এত কথা চিন্তা করিবার সেই সময়ে বোধহয় আমার শক্তি ছিল না। আমি তা চৌকীর কোণে মা'র পায়ের কাছেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছি, ভোলানাথ মাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। সকলেই চুপ, মা যে আজ কি করিয়া ফেলিবেন সেই সকলের ভয়। হঠাৎ মা আলুথালু বেশেই উঠিয়া বসিলেন, চোখ তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। উঠিয়াই আমাকে বলিতেছেন, "ওঠ", আমি কলের পুতুলে মত দাঁড়াইলাম। শেষে বলিলেন (নিজে দুই পা মেলিয়া বসিয়াছিলেন) আমার দুই পায়ের উপর দুই পা দিয়া ঠিকভাবে দাঁড়া।" দরজার কাছেই

কত লোক দাঁড়াইয়া আছে, কি করিয়া তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইব? কিন্তু অত ভাবিবার অবসর তখন কোথায়? আদেশ পালন করিলাম। তখন মা কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ ফুলগুলিই আমার পায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে করিবার পর মা ঠাণ্ডা হইলেন। আমাকে নামিতে বলিলেন, নিজেও পা গুটাইয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। আবার সহাস্য মূর্তিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তোমার পায় হাত দিয়া কাহাকেও প্রণাম করিতে দিও না, ছোট ভাই বোনদেরও নয়।" পরে কোনও কারণে ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি দুই তিনজন ছাড়া আর কাহারও পায় হাত দিয়া প্রণাম করিও না।" আমি কোণের ভিতর আবার বসিয়া পড়িয়াছি। এবার মাকে ঠাণ্ডা দেখিয়া অভিমানে ভয়ানক কান্না আসিল, কেনই বা মা নিজে এভাবে আসিলেন, মালা ফুল দেওয়াইলেন, আবার এভাবে সকলের কাছে আমায় লজ্জা দিলেন। ভয় তখন চলিয়া গিয়াছে, মা ত স্থিরই হইয়াছেন। আমি কাঁদিতে লাগিলে মা হাসিয়া ভোলানাথকে বলিলেন, "দেখ ত ও কাঁদে কেন?" ভোলানাথ বলিলেন, "তুমি যে ভাব করিয়াছ কাঁদিবেই ত, এখন ঠাণ্ডা কর।" তখনও আমরা খুব বেশী দিন যাই নাই—তখন মা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়া বাস্তবিকই সেইদিন ঠাণ্ডা করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে আমি মাকে ফুল দিয়া পায়ে অঞ্জলি দিবার অনুমতি পাইয়া প্রতি অমাবস্যায় পূজা করিতাম। একদিন বলিলাম, "মা, আমি পূজা জানিনা।" মা বলিলেন, "তুমি যেভাবে দিবে তাহাতেই পূজা হইবে।" আমি সাধ্যমত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মা'র পায় দিলাম। যেদিন হইতে মা'র পায় অঞ্জলি দেওয়া আরম্ভ হইল সেদিন হইতে ঐ এক পায় ছাড়া আর কোথাও অঞ্জলি দিতাম না।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ১ম ভাগ—গুরুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীমায়ের দেহে সাধনার খেলা (কিছু বিবরণ)

২৪শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ৯-৯-৫২)

আজ বিকেলবেলা যখন আশ্রমের হলঘরে গেলাম তখন শুনিতে পাইলাম যে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী নবদ্বীপের সেবাদাসীর গল্প বলিতেছেন। তিনি কি ভাবে কিচ্ছু না খাইয়া ও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন সেই সব কথা বলিতেছিলেন। ঐ সময় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা মনোরমা দেবীর কথাও উঠিল। মা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি শচীবাবুর বোন তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল কিছু না খাইয়া বাঁচিয়ে ছিল। সর্পও যে ছয়মাস কিছু না খাইয়া বাঁচিয়া থাকে সে কথাও এ সম্পর্কে একজন বলিলেন।

ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিয়া সর্প কিছু না খাইয়া ছয়মাস বাঁচিয়া থাকে?'

মা। শুনিয়াছি এই সময়টা সর্প খেচরীমুদ্রা করিয়া থাকে। ইহা অবশ্য আমার শুনা কথা।

এইসব আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া মা তাঁহার সাধনের অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "এই যে খেচুরীমুদ্রার কথা বলা হইল না, এ দেহের যখন সাধনের খেলা চলিতেছিল তখন দেখিয়াছি যে এ দেহ বসিয়া আছে, পরে আপনা আপনি আসন হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিয়া যে কিছু করা হইতেছে তাহা নহে। এমন ভাবে দেহের আসন হইয়া গেল যেন মনে হইল কেহ স্ক্রু দিয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি আটকাইয়া দিল এবং জিভটা গিয়া তালুর সঙ্গে লাগিয়া গেল। জিভ ঐ ভাবে তালুর সঙ্গে আটকাইয়া যাইতেছে আর এ দেহ অবাক হইয়া উহা লক্ষ্য করিতেছে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। তখন তুমি কি সাক্ষীভাবে ঐ সকল দর্শন করিতে?

মা। সাক্ষীভাবে বলিতে যাহা বুঝা যায় ঠিক তাহা নহে, তবে সজ্ঞান অবস্থায় এই সব হইতেছে বলিয়া ইহাকে সাক্ষীভাবেও বলিতে পার। তখন সাধকের খেলা হইতেছিল কি না, তাই দেহের উপর দিয়া যাহা হইয়া যাইত উহার নূতনত্ব দেখিয়া কেমন যেন একটা অবাক্ ভাব। ইহার

পর দেখিতে পাইতাম যে জিভটা ধীরে ধীরে উল্টাইয়া যাইতেছে। উহা ঐরূপ হইত বলিয়া মনে কিন্তু কোন উদ্বেগ নাই। তখন মনের ভাব কতকটা এইরূপ—যাহা হইতেছে, হইতেছে; ইহার পর যাহা হইবার, হইবে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। এই সময় প্রাণ অপান বায়ুর ক্রিয়া কিরূপ হইত?

মা। দেহের যখন ঐ অবস্থা হইত তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতিও বদলাইয়া যাইত। ঐ ভাবে জিভ উল্টাইয়া গিয়া যে স্থিতিটা হইত উহাতে আহার নিদ্রার কোন প্রশ্নই থাকিত না এবং আহার নিদ্রা হইত না বলিয়া দেহের কোনো গ্লানিও থাকিত না। সারারাত হয়ত ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতাম। ভোলানাথ রাত্রির প্রথমভাগে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইত। এ দেহের বদ্ধ আসনও খুলিয়া গিয়াছে এবং জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। আর রাত্রিও প্রভাত হইয়া গিয়াছে। সকাল বেলা আবার গৃহকর্মাদি স্বাভাবিকভাবেই হইয়া যাইত। এইভাবে রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যাইত। কতদিন এই অবস্থা চলিবে তাহা অনেক সময় দৈববাণী হইতেও জানা যাইত। (নারায়ণ স্বামীকে) তুমি খেচরীমুদ্রার সময় বিন্দু বিন্দু (অমৃত) ক্ষরণের কথা, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বলিলে? উহা কিন্তু হইতে পারে। কারণ এ দেহের বেলায়ও দেখিয়াছি যে, দেহের ঐরূপ হইয়া জিভ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসিত তখন মুখে যে স্বাদ পাওয়া যাইত উহা কতকটা সরবতের মত। যদিও বুঝাইবার জন্য সরবৎ কথাটি বলিলাম, কিন্তু আস্বাদটি ঠিক সরবতের মতো নয়।

মুখের এই মিষ্টি স্বাদ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে পর বুঝা যাইত। পূর্ব্বে যে স্থিতির কথা বলিলাম যতক্ষণ ঐ স্থিতিতে থাকা হইত ততক্ষণ কিন্তু এসব কিছুই বুঝা যাইত না। দেহের ঐ অবস্থায় মুখে কিছু খাইতে দিলে উহা গ্রহণও হইত না বা ফেলিয়া দেওয়াও হইত না। ইহা দিদি (খুকুনীদিদি) দেখিয়াছে। হয়ত বেলা ১০টার সময় কিছু খাইতে দিয়াছে, বেলা ৪টার সময়ও দেখিতে পাইয়াছে যে, যে ভাবে উহারা যাহা কিছু মুখে দিয়াছে উহা সেই ভাবেই আছে। এই সব দেখিয়া ভোলানাথ খুব ভয় পাইত। পাছে না খাইতে খাইতে এ দেহ শেষ হইয়া যায়। মুখে যখন ঐরূপ মিষ্টি আস্বাদ পাওয়া যাইত তখন দেখা গিয়াছে যে এই

শরীরের উপর শত শত ডেঁয়ো সারি বাঁধিয়া উঠিয়াছে। উহারা কিন্তু এ দেহকে কখনও কামড়ায় নাই। এ দেহ যেন উহাদের বাড়ীঘর এই মনে করিয়া উহারা ইহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বেড়াইয়া বেড়াইত। এ সব দেখিয়াও ভোলানাথ ভয় পাইত, কারণ এ সমস্তই অস্বাভাবিক কি না।

দেহের গতিও যে অব্যাহত হইতে পারে তাহাও সাধনের খেলার সময় দেখা গিয়াছে। যখন শা'বাগে থাকা হইত তখন ভোলানাথ এ দেহকে লইয়া কত দুশ্চিন্তাই না ভোগ করিত কারণ কখন যে এ দেহ কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা ছিল না। শা'বাগের মধ্যে একটা জলের বড় চৌবাচ্চা ছিল। উহা বোধ হয় ৬/৭ হাত গভীর হইবে। একদিন এদেহ কি একভাবে শা'বাগের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িয়া গেল। ভোলানাথ দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল যে ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িয়া এ দেহের হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়া কি যেন হইয়া গিয়াছে।

ডাঃ পান্নালাল। আপনি যে এত নীচে পড়িয়া গেলেন, আপনার কি কোন চোট লাগিল না?

মা (হাসিয়া) তুলা যেরূপ উড়িয়া আসিয়া মাটিতে পড়ে এ দেহও ঠিক সেই ভাবে পড়িয়াছিল, কাজেই চোট লাগিবার কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। ভোলানাথ আমাকে চৌবাচ্চা হইতে তুলিবার কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া তাহার এক হাত চৌবাচ্চার মধ্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া হাকাহাকি ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এদিকে এ দেহও ভোলানাথের ঐ হাত ধরিয়া কিছু না ধরিয়া টক করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল।

ডাঃ পান্নালাল। কি ভাবে উঠিলেন?

মা। কেন? চৌবাচ্চার গা বাহিয়াই উপরে চলিয়া আসিলাম। দেওয়াল ইত্যাদি কোন খাড়া জিনিসের উপরেও মানুষ পিঁপড়ার মত হাটিয়া উপরে উঠিতে পারে। এই জন্যই ত সাধন অবস্থায় দেহের অব্যাহত গতির কথা বলা হইয়াছে। সাধনের খেলার সময় আরও কতরকম হইত—এক এক সময় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই পা দুটি বসার মত হইয়া যাইত। পরে (দুইহাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইয়া) এই দুইটি

আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দেহটা শূন্যে উঠিয়া দোল খাইতে থাকিত। পরে আঙ্গুলের উপর যে ভর ছিল তাহাও চলিয়া যাইত। দেহটা শূন্যে থাকিয়াই দোল খাইতে থাকিত। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিত, পাছে এ দেহ শূন্যে উঠিয়া কোথায় ও মিলিয়া যায়। তখন এ দেহকে লক্ষ্য করিয়া যে কত কথাই বলিত। স্বামী যেরূপ স্ত্রীর উপর দাবি করিয়া কথা বলে উহা অবশ্য সেরূপ ছিল না। এ দেহের প্রতি তখন তাহার মানুষভাব থাকিত না এবং ঐ ভাবে থাকিয়াই সে তাহার কাকুতিমিনতি জানাইত।

কি ভঙ্গিতে ভোলানাথ ঐ সকল কথা বলিতেন মা তাহা অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিতে লাগিলাম। এই সময় নারায়ণ স্বামী বলিলেন, "একসময় তো তুমি পালঙ্কসহ উপরে উঠিয়া গিয়াছিলে।" ঐ কথা শুনিয়া মা হাসিলেন। কথাটা আমাদের নিকট একেবারেই নূতন বলিয়া আমরাও ঐ ঘটনার কথা মা কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "এখন উহা আসিতেছে না। যদি কখনও আসে তবে বলা যাইবে।"

সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়াছে দেখিয়া মা হলঘর হইতে উপরে চলিয়া আসিলেন।

রাত্রিতেও মা কিছুক্ষণের জন্য চত্বরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তখন নানা কথার মধ্যে মা বলিয়াছিলেন, "যাহা একবার বলা হইয়া যায়, উহার আর ঠিক ঠিক নকল করা যায় না, কারণ প্রতি মুহূর্তেই লোক পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে কিনা?' তবে তেমন যদি স্থিতিলাভ করা যায় তবে আবার ঠিক ঠিক ভাবে নকলও করা যায়।"

মা আনন্দময়ী, অমৃতবার্তা

মা আনন্দময়ীর সান্নিধ্যে সূক্ষ্মদেহীরা

সূক্ষ্মদেহী মহাত্মারা কখনও বা আসেন শূন্যপথে। মাতৃসান্নিধ্যে এসে তাঁরা মর্ত্যেই অমৃতলোকের সুবাস ছড়ান....।

নর্মদাতীরে চান্দোদ। পবিত্র পরিবেশ। সাধন-ভজনের উপযুক্ত জায়গা। সেখানে আনন্দময়ী আশ্রমে মা। সঙ্গে বিশিষ্ট মাতৃভক্ত নারায়ণ স্বামীজী। একদিন রাত্রে; নিঝুম নিঃস্তব্ধ চারিদিক। নারায়ণ স্বামীজী হঠাৎ দেখেন, শূন্যের উপর দিয়া কে যেন হেঁটে যাচ্ছেন। স্বামীজী স্তব্ধ, বিস্মিত। নারায়ণ স্বামীজী উচ্চকোটির সাধক ছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এ ধরনের শূন্যপথবিহারীকে শুধুমাত্র শুদ্ধাত্মারাই দেখতে পান। যেমন, ভাকসুতে গোমতী গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে খেচর অবধূত দর্শন করেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। (শ্রীশ্রীবালানন্দ জীবনী ১৩৭৯, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দ ব্রহ্মচারী; পৃঃ ২৩৯-২৪০)। যাইহোক নারায়ণ স্বামী শুনেছেন দেবতা ও মহাপুরুষরা মাটি না ছুঁয়ে শূন্যপথে যাতায়াত করেন। আরও শুনেছেন, ব্যাসদেব শুকদেব ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রমুখ মহাত্মারা মা'র কাছে এসে থাকেন। কিন্তু ইনি? .....নারায়ণ স্বামীজী শূন্যপথ-বিহারীকে ঠিক চিনলেন না। পরদিন মা'কে জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত্রিতে তোমার কাছে কে এসেছিলেন?" মা বললেন, "শ্রীমদ্ভাগবতের শুকদেব। তাঁর অদূর স্থিত মন্দির দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন।" চান্দোদ থেকে মাইল তিনেক দূরে শুকদেব এর মন্দির। পরদিন সেই মন্দির দর্শনে মা ভক্তদের নিয়ে গেলেন। (আনন্দ বার্তা: বর্ষ ৫১, ২য় সংখ্যা; এপ্রিল ১৯৮৪: পৃ: ১৩১-১৩২। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—শৈলেন ব্রহ্মচারী)।

এই চান্দোদেই একবার। অভয়জী মা'কে প্রশ্ন করেন, তাঁর কাছে যে সব সূক্ষ্মশরীরীরা আসেন, তাঁদের মধ্যে মহাপুরুষরাও থাকেন কি? বিজয় গোস্বামী, গম্ভীরনাথ বাবাজী কি এসেছিলেন?" মা বলেন, "হ্যাঁ, মেয়েটাকে দর্শন দিতে ত সকলেই আসেন।" অভয়জী জানতে চান, "আপনি তাঁদের দেখেচেন?" মা জানান, "হ্যাঁ, দেখেছি।" এবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে মা'র দেখা হবার ঘটনাটি উঠল।

তা অনেকটা এরকম—মা তখন ত্রিপুরায়, বিদ্যাকূটে। একদিন দেখেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর, আর সেই ঘরে ঠাকুরের বিছানায় মা শুয়ে। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা'র কোলের কাছে। তিনিও শুয়ে। তাঁর ভাব ছেলেমানুষের মতো। মা-ও যেন ছেলেমানুষ। দু'জনে একইভাবে বিভোর। বিছানায় শুয়ে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তখন দাড়ি-গোঁফ একটু একটু পেকে উঠেছে—যা যেন তা'ও দেখলেন। ঠাকুরের ভাবটি অতি সুন্দর। খানিক পরে মা'র কোলের কাছ থেকে উঠলেন তিনি। খড়ম পায়ে খুট্ খুট্ করে ঘরময় হাঁটতে লাগলেন। মা তখনও দক্ষিণেশ্বর দেখেন নি। পরে ওখানে গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাকূটে যেমন দেখেছিলেন তেমনই। এইভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মা'র প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর আরও একবার দেরাদূনের কল্যাণবনে সাক্ষাৎ হয়। সূক্ষ্মশরীরী মহাপুরুষ প্রসঙ্গে মা অভয়জীকে বলেছিলেন "মেয়েটাকে দেখা দিতে আসে ত।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৭ম ভাগ, পূর্বার্ধ, ১৩৮৯, পৃ: ১৭-১৮, গুরুপ্রিয়া)।

মা আনন্দময়ী সর্বব্যাপিকা। অনুক্ষণ সমদৃষ্টিতে স্থিতা। স্থূলের সঙ্গে যেমন, সূক্ষ্মের সঙ্গেও তেমনি নিরন্তর তাঁর আদান-প্রদান।..... ১৩৪৫-এর ২৩ চৈত্র। মা দেরাদুন আশ্রমে। রাত প্রায় এগারোটা। মা'র ঘরে দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী শুয়ে। হঠাৎ মা দিদিকে ডাকলেন, "খুকুনী, উঠে আয়।" দিদি কালবিলম্ব না করে কাছে যেতেই মা বললেন, "শরীরটা ঠিক নাই; একজন বসে থাকিস।" দিদি বসলেন। মা'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রাত যখন প্রায় আড়াইটে, মা বললেন, "শুইতে যা।" দিদি বললেন, "তুমি না একজনকে বসে থাকতে বলেছিলে?" মা চোখ-বোজা অবস্থায় জানালেন, "এখন আর দরকার নাই; শুইয়া থাক। কাল..... নিজে না উঠা পর্য্যন্ত তোরা..... ডাকিস না। কেউ যদি ঘরে চুপ করে বসে ধ্যান-জপ করতে চাস তবে করিস, না হলে দরজা বন্ধ করে রাখিস।" পরদিন; ২৪শে চৈত্র বেলা এগারোটার পর মা উঠলেন। কিছুক্ষণ পর আগের রাত্রির অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে বলতে লাগলেন, "তোমরা যেমন বসে কথাবার্তা বল তেমনি অন্য স্থানে কথাবার্তা হচ্ছিল। তাই বলে রেখেছি, ডেকো না। তোমাদের মধ্যেও

অনেক সময় অনেকে আসে, তোমরা দেখতে পাও না। যদি তেমন ধ্যান-ধারণা করবার শক্ত কা'রও থাকে, সে কাছে বসেই বার্তা হয়।" দিদি বললেন, "কাল রাত্রিতে যে বলেছিলে, একজন বসে থাক, তখন কী হয়েছিল?" মা বললেন, "শরীরটা অন্যত্র চলে গিয়েছিল।" কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, "তিনটি সূক্ষ্মশরীরী এসেছিল। তাদের সঙ্গে অনেক কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।" ২৬শে চৈত্র মা দিদিকে এ-নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানালেন, "দেখ....সেদিন দেখছিলাম, তিনজন এসেছে, একজন যেন এই শরীর (নিজ শরীর দেখিয়ে) স্পর্শ করতেও সাহস পাচ্ছে না, যেমন ভিন্ন ছোট জাতিরা ব্রাহ্মণদের ঘরে ঢুকতে সাহস পায় না; সংকোচে দরজায় দাঁড়ায়, কতকটা সেইভাব, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। আর একজন যেন এই শরীরটা পাহারা দেওয়ার মত দাঁড়িয়ে আছে, আর পূর্বোক্তাটিকে বলছে, 'সাবধান, ছুঁস না' এই শরীর (নিজ শরীর দেখিয়ে) ছুঁতে দেবে না, সে-ও হাত নেড়ে বলছে, 'না না, আমি ত ঐ শরীর ছুঁবার অধিকারী নই; আমি ছুঁবো না।' আরও একজন এসেছিল। দিদি বললেন, "কেন এসেছিল মা?" মা বললেন, "দেখাশুনা করতে। কথাবার্তা অনেক হল"। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৭ম ভাগ, পূর্বাধি, ১৩৮৯, পৃ: ১৬৫-১৬৭— গুরুপ্রিয়া দেবী)।

এই সব দেখাশুনা, কথাবার্তা, সূক্ষ্মশরীরীদের এই আবির্ভাব এদের মধ্য দিয়ে মা কি নিজের জগদ্ধাত্রী জগত্তারিণীর স্বরূপটি আভাসে ব্যক্ত করছেন? একি এককে বহু করে নিজেকেই নিজের আস্বাদন করা?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা, অক্টোবর ১৯৯৫

শাহবাগে নবাবের বাড়ীতে কালীপূজা

মুসলমান নবাবের বাগানে একবার দীপান্বিতা উপলক্ষে শ্রীশ্রীকালীপূজার আয়োজন ভক্তগণ করেন। সকলের আকুল প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত এই কালীপূজা শ্রীশ্রীমাকেই করিতে হইয়াছিল। পূজা করিতে করিতে মা হঠাৎ বলিলেন, "তোমরা সকলে চোখ বোজ। খানিক পরে আবার বলিলেন, "রামদেইয়া (বাগানের এক মালীর স্ত্রী) এখনও চোখ বন্ধ করে নাই।" এই সময়ে যে মা কি করিলেন তাহা মাই জানেন। কিছুক্ষণ পর যখন সকলে চক্ষু উন্মীলন করিলেন তখন দেখা গেল শ্রীশ্রীকালীমাতার মূর্ত্তির সহিত ঘেঁষিয়া বসিয়া আছেন এবং বাবা শ্রীভোলানাথ পূজকের আসনে বসিয়া দুই হস্তে জবাবিল্বদলের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইয়া মায়ের চরণে ভক্তিভাবে অর্পণ করিতেছেন। সে যে কি অপরূপ দৃশ্য তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নহে। পত্নীর চরণে পতির পুষ্পাঞ্জলি! এ কি কেহ কল্পনা করিতে পারে?

এই শ্রীশ্রীকালীপূজা যতটা আমার ধারণা ১৯২৪, অথবা ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে হইয়াছিল। মূর্তিও বহুদিন ছিল। বিসর্জন করা হয় নাই। এই কালীপূজার যজ্ঞের অগ্নি নির্বাপিত করা হইল না। উহা সযত্নে রক্ষা করা হইতে লাগিল এবং নিত্য ঐ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত। এখনও ঐ অগ্নি কাশী, নৈমিষারণ্য ও কন্‌খলে স্বতন্ত্র যজ্ঞশালায় সুরক্ষিত আছে এবং উহাতে নিত্য যজ্ঞ হয়।

মায়ের কথা

(মায়ের সান্নিধ্যে সূক্ষ্মদেহীরা)

মা'র সূক্ষ্মদর্শনের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ 'অখণ্ডভাবঘন'র স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা। ১৩৪৪ সালের (১৯৩৭ খৃঃ) ফাল্গুন। মা হরিদ্বারে, হরনাথ ঘাটে, ডাঃ পীতাম্বর পন্থের বাড়ীতে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড। গঙ্গার উপর। দলবল নিয়ে মা এখানে এসেছেন। রাত্রিতে তিনি বিচিত্র দু' ঘটনার কথা দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীকে বললেন। ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি তাঁর অনন্য দর্শনকে ঘিরে। তা অনেকটা এইরকম—একদিন মা যেন দেখছেন, এক জায়গায় একভাবে বসে। কেউ সঙ্গে নেই। মা'র বসার জায়গাটা উঁচু মতন, ঘাস ও ছোট পাথরে ভরা। সেখানেই একটি বিশেষ স্থান আছে আবার; নাম 'কল্যাণবন'। মা দেখলেন, যত দেবতা নিজ নিজ বাহন নিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। মা'র ভাষায়, "এই শরীরটার উদ্দেশ্যে নমস্কার করছে, সকলেরই ঐ ভাব, কত মুনিঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, অবতার—সব বেশ সুন্দর, নিজ নিজ ভাবে যাঁর যাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। আর যে সব উচ্চাবস্থার সাধকদের কথা শোনা যায়, তোদের জানিত ও অজানিত, ওখানে তাঁদের মূর্ত্তিও পরিষ্কার দেখছি। সাধকরা আসা-যাওয়া করছে। স্তরে স্তরে আছে বিরাট সমুদ্রের মত, দেখতে অন্ত নাই—এত সব। সকলেই, এই শরীরটা যে একটু উপরে বসে আছে, তাই ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে প্রণাম করছে। এই শরীরটা তীব্র শুভ্র ঘন জ্যোতির গড়া।" এ প্রসঙ্গে মা আবারও বললেন, "ভাষায় মুখ দিয়ে বের হল, 'অখণ্ড ভাবঘন।" খণ্ড বাদ দিয়ে নয়, সব নিয়েই ত অখণ্ড। দেবতা, সাধুরা ও ঋষিরা এমনভাবে ছিল যে তার কিন্তু শেষ দেখা যাচ্ছিল না। সমুদ্রের মতো যতদূর তোদের দৃষ্টিতে চলে, শেষ দেখা যায় না। সব স্থিরভাবে এই শরীরটার কাছে। এ শরীরটা ত বিছানায় শোওয়া। কোনো কোনো সাধু চলাফেরা করছে আর ঐ শরীরটার কাছে এসে পায়ের ধূলা নিচ্ছে। এবং সাধুরা মনে মনে এই শরীরটার সুস্থতা প্রার্থনা করছে— এই শরীরটার কাছেই।"—এই বিশেষ ভাব সম্পর্কে

মা একদিন দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীকে বলেছিলেন, "অখণ্ডভাব ঘন এই একটা ভাবেরই ঐ সব মূর্ত্তি। যেমন আকর্ষণ—কৃষ্ণ, রম্যরস—রাম বলে থাকে, সেরূপ এক অখণ্ড ভাব হতেই অনন্ত ভাব, বাইরে-ভিতরে ঐরূপ অনন্ত মূর্তিরূপে প্রকাশ—নিত্য বিরাজিত। তাই বলি, সেই সব মূর্তিরও ত শেষ নাই। সমুদ্রের মত অপার ও অনন্ত।" 'অখণ্ডভাবঘন'র স্বরূপ সম্পর্কে মা দিদিকে আর একদিন বলেছিলেন, "যা স্থায়ী, অস্থায়ী, অনিত্য, নিত্য যা কখনও খণ্ড হয় না। এখন বুঝে লও।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী: ৫ম ভাগ, ১৩৮৮, পৃ: ২৫৭-২৫৯, ২৭৪, ৩৫২-৩৫৩—গুরুপ্রিয়া দেবী)।

এখানে 'অখণ্ডভাবঘন' কে কেন্দ্র করে মা আনন্দময়ী যেন তাঁর স্বরূপকেই ব্যক্ত করলেন। ঋষি-মুনি, দেবতা-অবতার সবাইকে নিয়েই যেন তাঁর অস্তিত্ব। সবাই তাঁর কাছে, তিনিও সকলের। এক অখণ্ড তাঁর বাস। তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলে, সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া যায়।' এক কথায়, বিশ্বভূবন মা'তে বিধৃত। তাই ভুবন-প্রতিপালকেরা মাতৃসান্নিধ্যে। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী আমাদের মা। দেবদেবীরা তাঁকে দর্শন করতে আসেন। মা বলেন, দর্শন দিতে। কখনও সর্বসমক্ষেও এই দর্শন হয়। মা সূক্ষ্মে দর্শন করেন। ১৩৪৮-এর ১৩ই বৈশাখ। মা দেরাদুনে, রায়পুর আশ্রমে। নতুন গড়া একটি ঘরে শুয়ে। পরমানন্দ স্বামী, মটরী পিসিমা, অভয়জী ও দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীও সেই ঘরে। রাত প্রায় বারোটা। চারিদিক স্তব্ধ। আরণ্যক পাহাড়পুরী নিঝুম একেবারে। হঠাৎ মা বললেন,—"একজন এসেছে দেখছি। বৈষ্ণব, স্বরূপ মুছে গেছে। গলায় একটি ঘটি বেঁধে নিয়েছে। ঘটিটা বেশ পরিষ্কার। মাথায় পাগড়ী বাঁধা।" একটু পরেই আবার বললেন, "ওমা, গণেশজী হয়ে গেল।" ঘরে যে ভক্তরা ছিলেন, তাঁরা কিছুই দেখতে পেলেন না। অভয়জী মা'কে প্রশ্ন করলেন, "ঐ বৈষ্ণব মূর্তিই কি গণেশজী হয়ে গেল।" মা বললেন, "হ্যাঁ, তোরা সব প্রণাম কর।" মা'র নির্দেশ-মতো সবাই প্রণাম করলেন। ভক্তদের একজন জানতে চাইলেন, "মা, গণেশজী কী করছেন? এখনও কি এখানেই আছেন?" মা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আমার চৌকীর কোন বরাবর

দরজার ঐ দিকে।" এরপর হাত জোড় করে দেখিয়ে বললেন, "এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।" পরমানন্দ স্বামী ও অভয়জী বললেন, "মা'কে প্রণাম করে না কেন?" মা একটু হেসে বললেন, "ওমা! শোন কথা! কিন্তু চৌকীর উপর মাথা রেখে প্রণামের মতই করছে। এখনও যায় নি।" খানিক পরে বললেন, "এখন নেই।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৭ম ভাগ, উত্তরার্ধ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৮—গুরুপ্রিয়া দেবী)।

ঋষিকেশে আত্মবিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত নবম সংযম সপ্তাহের তৃতীয় দিনে মা শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরজীকে সূক্ষ্মে দর্শন করেন। মা'র কথায়, "আজ দেখিলাম, উত্তরের দিকে একটি ছায়ামূর্তি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। শ্বেত বস্ত্র পরিয়া আছেন ও লম্বা কেশ। এরপর দেখিলাম, এক ব্যক্তি আসনে কাপড় ঢাকিয়া বসিয়া আছে। মুখ খুলিয়া দেখিলাম, মহাবীরজী। সকালে রাম-নবমীর জন্য শ্রীরামের পূজা হইতে ছিল, পূজার মধ্যে যখন রামের ফটো ওঠানো হইল, শূন্যে রামের দু'টি চরণ দেখিলাম। পরে রামের বাল-স্বরূপ দেখিলাম। যখন চরণ শূন্যে দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ কান্তিভাইকে চৌকি দিতে বলিলাম। আরও দেখিলাম—মহাবীরের পিছনে দেখিলাম কি জান? কেউ শবাসনে শুইয়া আছে। আর একজন কূর্মাসন করিতেছে। এরপর চরণ দেখিলাম, আর শ্রীরামের বাল-স্বরূপ।"

(আনন্দবার্তা, এপ্রিল ১৯৮১, মাতৃ-সৎসঙ্গ—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি)।

মা'র মহাদেব-দর্শনের ঘটনাটিও বিস্ময় কর। .....১৯৬৪-র ৩ মে। মা আলমোড়া থেকে ধবলচীনা হয়ে 'খালী-স্টেট' যাচ্ছেন। সেখানে থাকেন নবনীত ভাই, মা'র পুরাতন ভক্ত। মা নবনীত ভাইয়ের বাড়ীর কাছে এসেই বাস থেকে হঠাৎ নেমে পড়লেন। তিনি যখন বাসে আসছিলেন তখন দেখেন, শূন্যে মহাদেব তাঁকে হাত দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একটু পরে মহাদেব শূন্যে থেকে মাটিতে নামলেন। ঠিক সে-সময়েই মা বাস থেকে নেমে পড়েন। মা বলেছিলেন, "মহাদেবের নধর কান্তি। গলায় লক লক করছে সাপ।" আসলে মহাদেব তাঁর জায়গা নিজেই মা'কে

দেখিয়ে নিয়ে গেছেন; নবনীত ভাইয়ের বাড়ীতে মা'র প্রশ্ন ও ভক্তদের উত্তর থেকে তা পরিষ্কার হয়। মা জানতে চান, "এখানে কাছেই শিবমন্দির আছে নাকি?" একজন ভক্ত জানান, এক সময় শিবমন্দির ছিল। কিন্তু এই বাড়ীর আগেকার মালিক এক ইংরেজ প্রিন্সিপাল সেই শিব নীচে রেখে আসেন। একথা শুনে মা নবনীত ভাইকে সেদিন বলেন, বাড়ীতে শিব-প্রতিষ্ঠা করতে।

(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সপ্তদশ ভাগ, ১৯৭৫, পৃ: ১২৩।)

মাতৃসান্নিধ্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব কথাও বড় বিচিত্র। ......১৩৪৬ সালের ১১ই পৌষ। মা আগড়পাড়ায়। গিরিবালা দেবীর রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আছেন। বিরাট মন্দির। রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তিটিও অপরূপ। পাশেই গঙ্গা। এই গঙ্গাতীরেই ছোট একটি ঘরে থাকেন। ২৩শে পৌষ দুপুরে মা চোখ বুজে শুয়ে। দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী কাছেই, মা'র পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ মা খুব ধীরে ধীরে বললেন, "একটা মূর্ত্তি দেখছি।" বলেই চুপ করলেন। আর কিছু বললেন না।..... ঐ দিনই বিকেলে ভক্তরা অনেকে এসেছেন। মা বিছানায় বসে। হঠাৎ বললেন, "আজ দুপুরে দেখছিলাম, তোমরা ছদ্মবেশ না কি বল, সেইরকম ছদ্মবেশে বিধবার বেশে একজন স্ত্রীলোক এসে এই স্থানে দাঁড়িয়েছে। এই ঘরের দেয়াল যেন কিছুই নাই। স্ত্রীলোকটির মুখখানা যেন বিষন্ন। চোখে একটু একটু জল। তারপর যেমন তোমাদের বলা হয় না; 'কে গো তুমি?' তেমনই তাকে বলা হয়, 'কে গো তুমি?' অমনি সে ফিক করে হেসে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ঐ রাধাগোবিন্দের মন্দিরের দিকে চলল। যেতে যেতে রাধার মূর্ত্তিটি যেখানে আছে সেখানে গেল। তখন আর রাধার মূর্ত্তিটি তথায় ছিল না। এই স্ত্রীলোকটি গিয়ে ঐ স্থানে বেদীর উপর পা ঝুলিয়ে বসল। খানিক পর সে রাধার মূর্ত্তিতে পরিণত হল।" মা এই অবধি বলে হাসতে লাগলেন। ভক্তরা বলাবলি করলেন, "মা'র নিকট আজ রাধা এসেছিলেন।" একটু পর মা আবার বললেন, "এরপর আবার দেখছিলাম, ঠিক রাধাকৃষ্ণের যে রকম মূর্ত্তি আছে, ঠিক ঐ রকমই; যেমন পুতুলের মূর্ত্তি হয়, ঠিক ঐ সাইজের ঐ রকমই রাধাকৃষ্ণের

মূর্ত্তি দুইখানা এই শরীরটার উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। দিতে দিতে সব এক হয়ে গেল।"

(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৭ম ভাগ, পূর্বাধি, ১৩৮৯, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)

গোপিনীদের নিয়েও কত লীলা মা'র। ওরা আসেন, সূক্ষ্মে নৃত্য করেন মা'কে ঘিরে। একবার সোলনে; আষাঢ়ের প্রথম দিক তখন, ১৩৫৩ সাল। সৎসঙ্গ, পূজা পাঠ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে চলছে। সোলনের মাতৃভক্ত রাজা দুর্গা সিং কোনো ব্যবস্থাতেই কিছু ত্রুটি রাখেন নি। হরিবাবা, শরণানন্দজী প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মারাও এসেছেন। অসংখ্য ভক্ত-সমাগম চলছে। সোলনে আনন্দের হাট। .....কয়েক দিন ধরে হরিবাবা 'গোপীহৃদয়' নামে একটি নূতন বই পড়ছেন। বইটি বাবার খুবই প্রিয়। অনেককেই পড়ে শোনায়। বইয়ের বিষয়, 'গোপীদের প্রেম।' সেটি পাঠ করার আগে হরিবাবা কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন। বইটি তাঁর হাতে থাকে তখন। তারপর বইকে প্রণাম করে পাঠ শুরু করেন। ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বাবা যেন গদগদ। পাঠ-শুরুর আগে তিনি যন 'বইখানির প্রাণ সঞ্চার' করে নেন। এক ভক্তকে বলতে শোনা যায়, "বইখানিকে যেন দেবতা করে নেন।" ....২রা আষাঢ় মা এ-সম্পর্কে বললেন—অনেকটা রাত্রি হয়েছে তখন। তিনি শুয়ে আছেন। সামনেই দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী, রেণুদি প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্ত। মা বললেন, "আজ দুপুরে যখন পাশের ছোট ঘরটিতে শুয়েছিলাম, তখন দেখছি কি জানিস? দেখছি একটি রাসমণ্ডল। গোপিনীরা একটি সূত্র যেন গোলকার করে ধরে দাঁড়িয়েছে। সূত্র কী, বুঝলি না? অর্থাৎ নিজেরাই, হাত-ধরাধরি করে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি গোপিনী তালে তালে নাচতে নাচতে একবার এই শরীরটার কাছে আসছে, আবার যেখানে গোপিনীরা হাত-ধরাধরি করে মণ্ডল করে দাঁড়িয়েছে তাদের হাতের নীচ দিয়ে গিয়ে ঐ মণ্ডলের মধ্যে নাচছে। এ শরীরটা ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। গোপিনীদের ঐ দলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নেই; তবে ঐখানে তিনি আছেন কিনা তা বলা আসছে না।" এই অবধি বলে মা উপস্থিত ভক্তদের প্রশ্ন করলেন, "পিতাজীর (হরিবাবার) নিকট থেকে তোমরা যে

'গোপীহৃদয়' বইখানা পড়তে এনেছ, সে বইখানা কোথায়?" রেণুদি বললেন, "তা বিথুর কাছে আছে।" বিথুদির কাছ থেকে জানা গেল, মা দুপুরে যে ঘরে শুয়েছিলেন, তার পাশের যে লম্বা ঘরটি, সেই ঘরের ড্রেসিং টেবিল-এর ড্রয়ার-এর ভিতর তখন বইটি ছিল। ঐ ঘরেই রাসমণ্ডল দেখেন মা। মা'র ভাষায়, "যে গোপিনীটি নেচে ছিল, সে কিন্তু ঐ টেবিলের ড্রয়ার-এর যে দিকে বইখানি ছিল সেই দিক থেকেই বের হয়ে এসেছিল। বইখানি কিন্তু সাধারণ নয়।"—সেই সময় কৃষ্ণ কোথায় ছিলেন, দু'-তিনবার মা'কে এই প্রশ্ন করা হলে মা বললেন, "কৃষ্ণ কোথায় ছিলেন তা বলা আসছে না।" এবার অন্ধ সাধু শরণানন্দজী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "যিনি (অর্থাৎ, 'মা') এক পাশে দাঁড়িয়ে এই নৃত্য দেখছিলেন, তিনি কৃষ্ণ নন ত? কৃষ্ণ ছাড়া অপর কা'রও নিকট ত গোপিনীরা নাচে না!" মা এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু জানা গেল, তা থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, মা নিজেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ? 'গোপীহৃদয়' নামক বইটিতে প্রাণসঞ্চারহেতু গোপিনীদের নাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণরূপী মা'র সম্মুখে? কৃপাময়ী মা কি প্রকারান্তরে আত্মপরিচয় দিলেন এখানে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা জানুয়ারী ১৯৯৬, পৃঃ ৬



মাতাজীর দর্শন দান

মেলিটা ম্যাসমান

সে সময়টা ছিল ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মের শেষের দিক। ভারত পরিদর্শনে এসেছি আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য। ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমি। কারণ ভারত-ভ্রমণে আসা তো আর হয়ে উঠেনি পূর্বে। "অদৃষ্টের" চালনায় (যদি তেমন কোন বস্তু থেকে থাকে) প্রথম প্রথম আমার যাতায়াত হয়েছিল বিখ্যাত এক সাধুর কাছে। তাঁর ঐ আশ্রমটি একদিন কর্মযোগের এক কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে বোধহয় সে বিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করা আমার অধিকারের বাইরে। কিন্তু তখন হতাশ হয়েছিলাম আমি; বোধহয় শুধু বাহ্যিক দিকটাই দেখেছিলাম সেদিন।

যাক, এই হতাশাপূর্ণ অভিজ্ঞতার পর থেকে ভারতের জীবিত সাধুদের থেকে দূরে থাকাই করলাম স্থির। ভারতবর্ষের মন্দিররাজির মধ্য দিয়ে অতীত আমাকে শোনাল তার কাহিনী! কিন্তু এবার অদৃষ্ট আমাকে নিয়ে এল সরাসরি কন্‌খলে মা আনন্দময়ীর কাছে। আশ্রমের ক্ষুদ্র আঙ্গিনাটিতে বসে বসে অপেক্ষা করছিলাম তাঁর জন্য, আর রাগ হচ্ছিল নিজেরই উপর। —সময়ের এই দারুণ অপচয় কেন করছি? তেমনিইতো হতাশ হব আর একবার। কেউ যদি বলত আমায় তখন, কয়েক ঘণ্টা পরেই একজন মনুষ্যদেহধারীর সম্মুখে তোমায় নত-জানু হতে হবে,— নিশ্চয়ই আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম সে কথা। আমার ধর্মীয় সংস্কার শুধু

---

* বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক Melita Maschman-এর লিখিত গ্রন্থাবলী বিভিন্ন ভাষাতেই অনূদিত হয়ে থাকে। লেখিকার "The Thirteen" নামক উপন্যাস ছ'টি ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রথমে জার্মান ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল। এটির ইংরেজী অনুবাদ Ananda Varta. Vol. XI-এ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা থেকে প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদের বর্তমান প্রয়াস করেছেন অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত।

ভগবদুপাসনার বিশেষ ভাব-গম্ভীর মুহূর্ত্ত ছাড়া এ জাতীয় প্রক্রিয়ার অসমর্থক।

গোটা পনের লোক অপেক্ষা করছিল আমার সঙ্গে। সন্ধ্যার সময় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি ছাদের বাগানে। একটু পরেই আবির্ভূতা হচ্ছেন মাতাজী। আমি যেন স্বতঃই প্রক্ষিপ্ত হলাম আমার জানুযুগলের উপর। মানুষের সম্মুখে আমি আমার বিশ্বাস-বিরোধী এই কাজটি করছি বলে, কোন বিচার জাগলো না তখন। পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ডে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তা সম অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ছাড়া অপরকে বোঝাতে পারবো না; তবে পারবো বাহ্য লক্ষণাদির কিছু বর্ণনা দিতে, পারবো উপমায় কিছু বলতে : কল্পনা করুন একটি বৃক্ষ—ধরুন সুন্দর সবল পুরাতন এক বীচ-বৃক্ষ এগিয়ে আসছে আপনার কাছে ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে :—আপনার কি রকম ভাব হবে তখন? আত্ম জিজ্ঞাসা জাগবে না কি : 'আমি কি পাগল হ'লাম?—না কি আমি স্বপ্ন দেখছি? সবশেষে সিদ্ধান্ত হবে বাস্তবতার অজ্ঞাতপূর্ব এক নূতন মাত্রাতে (dimension) প্রবেশ ঘটেছে আপনার। আমার অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই।

যতটা জানি, বৃক্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাটিতে মূল নিবদ্ধ রাখা; তাই নয় কি? তেমনি পাশ্চাত্য মতে মানুষ মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হল তার "আমি" "আমি"- রূপে বেঁচে থাকার মধ্যেই খৃষ্টানরা মানুষের অমরত্বের রহস্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু আজ আমি এমন একজন মানুষের পুরোবর্তী যাঁর মধ্য থেকে "আমি" সম্পূর্ণ ঘুচে গেছে বলে অনুভব করছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা এড়িয়ে বলতে পারি, কোন কোন মনোবিকারের রোগীর মধ্যে এই "আমি"টি কিঞ্চিৎ খাপছাড়া বা বিক্ষিপ্ত, তাই তাদের মধ্যে মানুষরূপে পরিচয় দেওয়ার মত বৈশিষ্ট্যেরও অবলুপ্তি ঘটে। এ ধরণের অনেক রোগীর সংশ্রবে এসেছি আমি, তাদের অতল-স্পর্শ বোধহীনতা এক ভীতির সঞ্চার করত আমার মধ্যে, যে ভীতি আমার জগতে প্রচণ্ড ঝড়ের পর পার্বত্য বনরাজির অবস্থা দেখে,—সেই বিরাট বিরাট সব বৃদ্ধ পাইন-বৃক্ষ, মাথাগুলি তাদের মাটিতে গোঁজা, আর শিকড়গুলি সব আকাশমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যাক সে-সব। দেখছি মাতাজীকে—দেখছি একজন মানবদেহীকে যাঁর মধ্যে "আমি" আর নেই একটুও। অথচ সেজন্য কারও থেকে হেয় নন তিনি; বরং আমার দেখা সকল মানুষের চেয়ে তিনি বড়।

পরে এ-সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা ক'রে আমি জেনেছি নিরহঙ্কার অবস্থা জীবন্মুক্তের একটি লক্ষণ। কিন্তু এ-বিষয়ে সে সময় স্বচক্ষে দেখা আমার এই অভিজ্ঞতার বাইরে কোন জ্ঞানই ছিলনা। আমার এই অনুভূতির মধ্যে ফাঁকি নেই, আমার বন্ধুদের কাছে লেখা আমার এক চিঠিতে রয়েছে তার প্রামাণ্য। সেই চিঠিতে রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার অসংবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিচিতি। আমি লিখেছিলাম "....আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন "আমি"....বিহীনা মানবী। —মাতা গঙ্গা বা পিতা হিমালয় যেমন। তাঁর দিকে তাকালেই মনে হয় সৎ বা অসতের অতীতে অবস্থান করেন তিনি।" (সে সময় আমার মধ্যে এইসব চিন্তা এসে ভিড় করলেও এসবের অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারতাম না তখন)। এ ধরণের কয়েকটি কথা কিছুদিন পর জানাচ্ছিলাম একজন আশ্রমবাসীকে। তিনি বললেন, মনে করবেন না, আপনি নিজের গুণেই তাঁকে চিনতে পেরেছেন দেখা মাত্র; মাতাজী কাকে কতটুকু বুঝতে দিতে চান, তাঁরই উপর নির্ভর করে সব।" আনন্দে সমর্থন করলাম। আমাদের জীবনে যা-কিছু মহৎ সবই যে দান, খৃষ্টানরা বলেন—কৃপা।

বুঝতে পারছি—অনাবশ্যক বাহুল্য রয়েছে আমার লেখায়। তার কারণ মাতাজীর নিজের সম্পর্কে তো কিছুই বলার সাহস নেই আমার, তাঁকে বর্ণনা করা তো আরও দূরের কথা। আমার ভ্রমণের ডায়রীতে কয়েকটি অন্ধকারে-হাতড়ানো ধরণের উক্তি রয়েছে; যেমন—"মাতাজীর এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যে ব্যক্তিত্বের বাণী আমরা শুনি সমুদ্রের তটভূমিতে, শুনি সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ঐসব ক্ষণিকের বাণী কার? শিশুর নামকরণের মত মানুষ যার নাম রেখেছে, সমুদ্র, তার বাণী নয় নিশ্চয়ই। মাতাজীর ও নিশ্চয়ই একটা নামকরণ হয়েছিল তাঁর জন্মের পরে। কিন্তু নামের আবরণে আবৃত্ত হয়ে তাঁর এই অস্তিত্বের অর্থ কি? তাঁকে নাম ধরে ডাকা আর ভারত মহাসাগরে লেবেলে এঁটে দেওয়ার চেষ্টা করা একই কথা।

ছাদের বাগানটির দূরপ্রান্তে মাতাজী ধীর পদক্ষেপে আসা যাওয়া করছিলেন। সময় সময় দাঁড়িয়ে তিনি তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে। বৈকালিক মেঘমালা প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁর চোখে।—আমার মধ্যে যে ভাবোদয় হচ্ছিল তখন, যুক্তিবদ্ধ চিন্তার সীমার বাইরে তা মেঘপুঞ্জ, বনরাজী, হিমালয়ের পর্বত প্রবাহ—সবই সেই দৃষ্টির অতলে তলিয়ে গেছে,—যেমন ঐটিই তাদের আপন আবাস। বৃষ্টি-জলের কাদা-গোলায় চন্দ্রের প্রতিফলনকে ছোট্ট আর অস্পষ্ট দেখায়। মায়ের চোখ আকাশের ছবিকে ধরেছিল বুকে, সমুদ্র যেমন বুকে ধরে সেই প্রতিবিম্বকে—ধরে ভগিনীর মত—একই সৃষ্টি-উৎস থেকে যে উৎসারিত তারা!

মাতাজীকে দেখার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সবচেয়ে অভিভূত আর হতবুদ্ধি হয়েছিলাম আমি এজন্য যে, আমার বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে 'মা আনন্দময়ীরূপ একটি তথ্যকে' কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না আমি। একটা বৃক্ষকে যদি পায়ে হেঁটে এগোতে দেখি, তাকে যেমন আমরা খাপ খাওয়াতে পারবো না আমাদের ধারনার সঙ্গে—ভয় হবে, বুঝি সমস্ত অভ্যস্ত নিয়মকে সেই উড়িয়ে দেবে ফুৎকারে,—ঠিক তেমনি হয়েছিল আমার।

খানিক বাদে মাতাজী আগের থেকে তৈরী করা এক আসনে এসে বসে কথা আরম্ভ করলেন সবার সঙ্গে। অপরিচিত ধাঁধার মত যে বস্তুটি তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল এতক্ষণ, সেটি যেন চলে গেল পিছনে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও সম্পূর্ণ ত্যাগ করা গেলনা সেটি,—শুধু ভুলে থাকার চেষ্টা ছাড়া। দেখছি, সাদা-শাড়ী-পরা একজন মহিলা (আমার অনুমানে পঞ্চাশের মত বয়স) তাকিয়ার মাঝে বসে রয়েছেন। ঝুরঝুরে ঢিলা চুলগুলি তাঁর ঝুলে পড়ছিল কাঁধে আর পিঠে। মিষ্টি আর প্রাণবন্ত ভাবে কথা-বার্ত্তা কইছিলেন তিনি। পরক্ষণেই গভীর ধ্যানে ডুবে যাচ্ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সস্নেহ রঙ্গ তামাসা তাঁর চোখের কোণে ধরা পড়ছিল। ইউরোপীয় পোষাক পরা এক বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন যখন, আমার মনে জাগছিল আমার এক গণিত শিক্ষকের কথা। সেই শিক্ষক মহাশয় ছিলেন বিরাট দার্শনিক। তিনি সর্ব্বদা গণিতের সূত্রের দ্বারা ভগবানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে

চাইতেন। এবার দেখি ছিন্ন-বসনা বৃদ্ধা এক চাষী রমণী মাতাজীর কাছ ঘেঁষে এসে বসল মেঝের উপর। চোখ দুটি তার অন্ধ প্রায়, গা-দিয়ে অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। মাতাজী তাঁর কাছ পর্য্যন্ত নত হলেন; মনে হল কয়েক মিনিট ধরে দুজনের মাথা প্রায় লাগালাগি হয়ে ছিল। শোনা যাচ্ছিল কোমল কণ্ঠের মৃদুস্বর। মাতাজী তাঁর সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে স্ত্রীলোকটির কথা শুনছিলেন। এমন এক করুণা ফুটে উঠেছিল যা শুধু— মানুষ পূর্ণতা পেলেই সম্ভব হতে পারে।

সেই বিকালেই আমি স্থির করলাম—আর সব কর্মসূচী বাতিল করে দেরাদুন রওনা হব আমি—কারণ মাতাজীও কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমি যা দেখছি বা অনুভব করছি তা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিলাম। পরিশেষে সে চেষ্টা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে, আপাততঃ সমস্ত অনুভূতি দিয়ে শুধুই গ্রহণ করবো ঠিক করলাম। কিষেণপুরে মাতাজী দৈনিক দু'বার করে দর্শন দিতেন ঘণ্টা দুয়ের জন্য। সে সময় প্রবল চাপ তাঁকে সইতে হ'ত ভক্ত ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের। সামান্য কয়েক ঘণ্টার নিদ্রা ছাড়া দিবারাত্রের বাকী সময়টা কাটতো তাঁর "প্রাইভেট" করে।

অনেক সময় ভিড়ে না বসে যাতে তাঁর কাছে বসতে পারি তার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতেন। আমার ভাবটা ছিল উৎসাহী সঙ্গীত-রসিকের মত। সে যেমন একই সঙ্গে একদিকে সঙ্গীতের মাধুর্যে মনপ্রাণ খুলে দিয়েও অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্রের বাদন-প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেয়, তেমনি মাতাজীর উপস্থিতি আমার ভিতরটাতে একদিকে এক দুর্নিবার অলৌকিক অনাস্বাদিতপূর্ব আকর্ষণে পূর্ণ করে দিলেও সেই সঙ্গে তাঁর আসল মানসিক দিকে সজাগ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টি রাখতাম আমি। আমি দেখেছি, তার পায়ের কাছে যারা ভু-লুণ্ঠিত হয়ে মাথা ঠেকাতো, তাদের মধ্যে কোন বহু-পরিচিতের মুখ দেখলে চোখদুটো কি উজ্জ্বল হয়ে উঠতো মাতাজীর। মনে হয় যেন দেখেছি গরমের কষ্ট ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যে। কোন জবরদস্ত ভক্তের কাছ থেকে যখন নিজের পা দুটিকে সরিয়ে নিতেন তিনি, তখন তাঁর মধ্যে একটু আত্মরক্ষার ভাবও রয়েছে বলে বোধ করেছি। লক্ষ্য করেছি, অনুপ্রাস অলঙ্কার দিয়ে কথা বলে কেমন

আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠেন তিনি (আশ্রমবাসী একজন তাঁর কথা অনুবাদ করে আমায় শুনিয়েছিলেন)। দেখেছি কেমন করে তিনি বিদায় দিয়েছেন, বোম্বের এক পার্শী মহিলাকে—অলৌকিক উপায়ে স্বামীর আরোগ্য ভিক্ষা চাইলে: "তোমার স্বামীকে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, আর তোমাদের উভয়ের শান্তির জন্য ভগবানকে ডাকো।" সেই মুহূর্ত্তে তাঁর মুখমণ্ডলে এক বেদনা-কাতর ভাব ফুটে উঠেছিল। আরও দেখেছি, সে-সময় তাঁর ভাব-ভঙ্গী, তাঁর মুখমণ্ডলের গভীর ছায়া ক্লান্তির ছবি এঁকে দিয়েছিল তাঁর মধ্যে। পরক্ষণেই তিনি উঠে গিয়েছিলেন পরিবৃত জনতার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে খৃষ্টান চিত্রকররা যীশু বা কোন সাধুর জীবনী থেকে কোন দৃশ্য আঁকতে হ'লে, পবিত্রতাকে ব্যক্ত করতে একটি সরল অথচ সার্থক উপায় অবলম্বন করতেন। যেমন, যীশুর জন্মের ছবি আঁকতে হলে তাঁরা সাধারণ একটি মানব শিশু এবং মানুষ পিতামাতার ছবি এঁকে তাঁদের পিছনে রাখতেন একটি সোনালী পটভূমি। এই সোনালী পটভূমি অবর্ণনীয় যে পবিত্রতা তাকে সূচিত করতো। কোন পূণ্য বার্তাকে ছবিতে ফোটাতে হলে চিত্রকর তাঁর তুলিতে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করতে পারতেন না, শুধু পারতেন, উজ্জ্বল পটভূমির রহস্যময় সংকেতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

আমরাও সেই শিল্পীদের মত মনে হচ্ছিল, মাতাজীর মধ্যে যেটুকু বর্ণনীয় তা হচ্ছে তাঁর সত্তার পরিচিত মানবিক উপাদান—আর যা তাঁর ঊর্ধ্বে, যা দিব্য, তাকে কি করে ব্যক্ত করবো তা আমিও জানি না। তবে চিত্রকরদের অনুরূপ একটি উপায় অবলম্বন করতে পারি আমি : কখনো কখনো আমি যেন দেখেছিলাম তাঁর নয়ন যুগল থেকে আলোকের ঝর্ণা ছড়িয়ে পড়ল; তবে এই পরমক্ষণ গুলিতে আমি অভূতপূর্ব এক ব্যথা অনুভব করতাম, আমার দৃষ্টিহীনতার জন্য। আমার মনে হত, যদি আর একটু উন্নত দ্রষ্টা হতাম আমি, দেখতে পেতাম তাঁর সমগ্র রূপটিকে এই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে। অনুভব করেছিলাম,—আমি এক পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে রয়েছি, যে প্রশান্তি আমার ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ করে দিয়ে যেতো। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে হলেও হৃদয় দিয়ে আমি অনুভব

করেছি—ধরতে পেরেছি এই অনুভূতির প্রভাব।

আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা যাক ঃ অবশ্য এর দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুদঘাটিতই রয়ে যাবে। মাতাজীর নিরহঙ্কার অবস্থার সঙ্গে এই দিব্য আলোর একটা যোগ রয়েছে বলেই অনুভব করেছিলাম। সর্বভূতের যে একটি শাশ্বত আশ্রয় রয়েছে তারই থেকে উৎসারিত এই আলো—আমরা নিঃসন্দেহে তাকে বলতে পারি "ঈশ্বর" আর সেই ঈশ্বর মাতাজীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত—কারণ তাঁর মধ্যে যে নেই আমিত্বের অনচ্ছ প্রতিবন্ধক, যে বস্তুটি আমাদের সবার মধ্যেই অল্প বিস্তর ঘন।

আর বলবার কথা হচ্ছে, ভেবে আমি কুল পাইনি,—সমাজের সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ নর-নারী লুটোচ্ছে যাঁর চরণ-তলে, তাঁর মধ্যে গর্ব কিংবা দীনতা কোনটিরই বিন্দুমাত্র রেখা ধরা পড়েনি আমার কাছে। ঐ যে বলেছি, প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল আমার, তিনি সৎ এবং অসতের ঊর্দ্ধে। মনে হয় তার সঙ্গে যোগ আছে এই তত্ত্বের। স্বীকার করতে বাধ্য আমি, এই ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম হয়নি আমার আজও। গভীরভাবে আরও ভাবতে হবে আমাকে। কারণ, জেনেছি এখন—হিন্দু শিক্ষার একটি মৌলিক অঙ্গের সঙ্গে সামজস্য আছে, আমার এই উক্তির।

মাতাজীর অলৌকিক শক্তি—ব্যক্তিত্বে তাঁর—কর্মে নয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়,—অনেক অনেক বছর কাটিয়ে এসেছেন তিনি শুধু তাঁর ইষ্টগোষ্ঠীর স্বার্থে। অবশ্য একথা আরও অনেকের সম্বন্ধেই বলা যায়; তবে তাঁদের ক্ষেত্রে পৃথক তাৎপর্য্য রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তাঁর সমস্ত জীবনটিকে মনে হবে একটি নিরবচ্ছিন্ন আত্মবলি—সুতরাং বলতে পারি সেটা "কর্ম"। তথাপি বহুদিন তাঁকে পর্য্যাবেক্ষণ করলে, এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে তাঁর অস্তিত্বের মৌলিক সত্বাটি কর্মের মধ্যে দিয়ে আর সার্থকতা খুঁজছে না। তাঁর কল্যাণ কর্মগুলি তাঁর স্বরূপ নয়। তাঁর জীবন হল বিশুদ্ধ আত্মস্থ সত্ত্বার প্রকাশ। বোধ হয় বলা উচিৎ ভগবদাশ্রিত সত্ত্বার প্রকাশ। তাই কল্যাণের যা উচ্চতম ধারণা আমাদের—তিনি তাই। তবে আমরা যারা কর্মের মধ্যে হাবু-ডুবু খেয়ে দিন কাটাচ্ছি, তাদের পক্ষে যেমন নৈতিক রীতিগুলি

প্রচেষ্টা ও দৈনন্দিন বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা উদ্‌যাপনের বস্তু, তাঁর পক্ষে সে কথা আর সত্য নয়। খৃষ্টান যাজক পল বলছেন, "খৃষ্ট হচ্ছেন সমস্ত রীতি-নীতির পারে।"—তিনি নৈতিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করার কথা বলছেন না।—সে-সব অনুশাসনের ক্রমিক পরিপূর্ণতার অবস্থাতেই ব্যক্ত করেছেন। যিনি "পিতার (বা ভগবানের) সঙ্গে এক হয়ে রয়েছেন," নীতি তাঁর কাছে অনুশাসনের ভঙ্গীতে আর দাবী পেশ করে না—শুধু তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল নৈতিক অনুশাসনের পূর্ণতা প্রকট হয়ে উঠে। মাতাজীর সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর মধ্যে ভাগবৎ সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি তো দেখেছেনই—যেমন আমরা দেখি ফুলের মধ্যে—বা বলিষ্ঠতর রূপে সমুদ্রে বা পর্বতে, —অধিকন্তু তাঁর মধ্যে দেখেছেন তাঁরা ভগবানের প্রেমকে। শুধু তাই নয়, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বটি হল স্বীয় অনুভূতিতে প্রকটিত দিব্য সত্যের ক্লান্তিহীন প্রেমপূর্ণ এক নূতন ঘোষণা। খ্রীষ্টান শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্টই হচ্ছেন ঈশ্বরের পূর্ণতম সন্তান—স্বয়ং পুত্র—কারণ, তাঁর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেমের পরিপূর্ণতা। সমুদ্র বা পর্বত ভাগবত প্রেমের পরিচয় দিতে পারে না, কিন্তু মানুষ যখন যথার্থ মানুষ হয়, ভগবানের প্রেম তখন ফুটে ওঠে তার মধ্যে। মাতাজীর সম্পর্কেও সেই কথা। তাই তিনি ধর্ম জগতেও প্রধান এক ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্ব বাণীর বাহক হয়েও সাক্ষীস্বরূপ।

মায়ের চরণ প্রান্তে বসেছিলাম অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে। ঘটনা বলতে, আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, শুধু এই। ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছিলাম একটা দিব্য ভাবের অস্তিত্ব। গীর্জার অনুষ্ঠানে যা অনুভব করেছি পূর্বে, তার চেয়ে অনেক বেশী। আমার বিশ্বাস—আমার ধারণা—এতসব ক্রিয়া কাণ্ড কেন না সেই দিব্য উপস্থিতি নেই বলেই তো। তাই এতসব তীব্র আকুতির ভঙ্গিমা, এত প্রার্থনা সেই তৎ-এর কাছে, যাঁকে জোর করে নামানো যায় না। কিন্তু দিব্যের আবির্ভাবে প্রার্থনা মৌনও হয়; তাঁর অলৌকিক উপস্থিতিতে মুছে যায় সব ক্রিয়াকাণ্ড। অদ্ভুত এক অনুভূতি এটা—কেমন করে বোঝাই অন্যকে—এ যেন প্রতীক্ষমান দৃষ্টির শূন্যতায় পূর্ণতার অনুভূতি, এ যেন বন্ধ চোখে

তাকিয়ে থাকার মধ্যে দৃষ্টির উন্মুক্ততা। দুই-একবার এই অনুভূতি এল আমার,—পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের পক্ষে দুরধিগম্য এটি। জানিনা মাতাজী নিজেকে নিজে কিভাবে দেখেন, নিশ্চয়ই আমাদের মত নয়। আমরা দেখি বিশেষ দীপ্ত আলোময় দিব্য জ্যোতিঃসম্পন্না মানবী রূপে, সেই একত্বের মধ্যেই তাঁর স্থিতি।

আমি যেন দেখলাম পবিত্রতার প্রতিমূর্তি আমাদের গোচরীভূতা এই মাতাজী এক ভাবগম্ভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে যুক্ত করে দিলেন আমাদের এক দিব্য সত্ত্বার সঙ্গে। যে সত্ত্বাটি তিনি নিজেই হয়ে রয়েছেন। আমার ডায়রীতে একটি অস্পষ্ট কথা রয়েছে দেখছি, "সময় সময় মনে হয় মাতাজী যেন নিজেই নিজের প্রতি ভক্তি নিবেদন করছেন, কিন্তু তাঁর এই ভাবটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক।" পরে আমি লীলার তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। এই লীলাবাদের মধ্যেই কি সম্ভাব্য রহস্য নিহীত রয়েছে?

মাতাজীকে দর্শনের অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ আমার তিন-চার বার হয়েছে। রস-মাধুর্যের কমতি হয় নি কখনো। কিন্তু একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন দেখে আমি অবাক হচ্ছি : আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ছিল—কেমন করে যেন আমি এক অজ্ঞাতপূর্ব জগতে ঢুকে পড়েছি; সে-ভাবটি পরে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে গিয়েছে;—আজ বুঝেছি এই সর্বপ্রথম আমি মানুষের খাঁটি বাস্তব রূপটি আবিষ্কার করেছি।

বাড়িয়ে বলছি মনে হতে পারে, দীনতার সঙ্গেই বলব, পরমেশ্বর মাতাজীর মধ্যে দর্শন দিয়েছেন আমাকে—আপন জনের ঘনিষ্ঠতায়! স্পষ্টতর রূপে বুঝেছি, তাঁর আর আমার মধ্যে মৌলিক ব্যবধান নেই কিছু; প্রদীপ আর সূর্য্যের দীপ্তিতে যে ব্যবধান শুধু সেইটুকু। ভগবৎ-কৃপায় এটি অবশ্যই এক বিরাট আবিষ্কার আমার। ভবিষ্যতে আমার জীবনের প্রবণতা অনুসারে এই সত্যের সার্থক রূপ দিতে চেষ্টিত হব—এই বাসনা।

কিষেণপুরে মাতাজীর শেষ দিনের দিনান্ত আমারও শেষ দিনান্ত। আমার স্মৃতিতে সেটি বিরাট মহোৎসবের দিন। শ' দুই লোক আশ্রমে জড় হয়েছে। দেখছি, মাতাজী আশ্রম প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ বিতরণ করছেন অক্লান্ত ভাবে—চার দিকে। গম্ভীর ভাব নিয়ে নয়, হেসে

হেসে, মায়ের মত—সন্তানের পরিতৃপ্তিতেই পরম খুসী হয়ে কখনো হয়তো তিনি অনেকের মাথার উপর দিয়ে একটি ফল ছুড়ে দিলেন দূরবর্তী কারও কাছে—দৃষ্টিতে-ব্যক্ত তার প্রার্থনাকে পূর্ণ করতে। এরপর অনেকক্ষণ তিনি আমাদের মধ্যে যাতায়াত করলেন, কখনো একটু কথা বললেন কোন শিশুর সঙ্গে, কখনো করলেন কারও সঙ্গে একটু রঙ্গ-রস, কারও প্রশ্নের জবাব দিলেন কখনো, কখনো বসলেন গিয়ে কীর্ত্তন গায়কের পাশে, আবার হয়ত কখনো উঠে চলা-ফেরা করতে লাগলেন আমাদের মধ্যে; যেন নিজেকেই তিনি দিতে চাইছেন বিলিয়ে।—শত হস্তে তিনি বিতরণ করছিলেন নিজেকে। এত সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি; কিম্বা স্পষ্টতর ভাষায় বলতে পারি, অবিনশ্বরের অলৌকিক সৌন্দর্য নশ্বর মাংসের মধ্য দিয়ে এত ভাস্বর রূপে দীপ্ত হতে আর দেখিনি কখনো।

সেইদিন সন্ধ্যাতে এক পরম-মুহূর্ত এল আমার। একটি মন্দির-মুখী জানালার আড়াআড়ি গরাদের আড়ালে ছিলাম দাঁড়িয়ে। মাতাজী মন্দিরগুলির মাঝখানে এসে একটুক্ষণের জন্য দাঁড়ালেন। পরিবেষ্টিত জনতা পড়েছিল অনেক পিছনে। স্মৃতিতে এখনো জাগছে, ঐ যেন মাতাজী আপন খেয়ালে দাঁড়িয়ে। আমি উপরে বাড়ালাম আমার যুগ্ম হস্ত—বিদায় জানালাম তাঁকে। আমার কারা-কক্ষ থেকে (গবাক্ষ-জালের আড়াল থেকে) আমার অভিবাদন ঊর্ধ্বপথে তাঁর মুক্তির রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলো। তিনিও যুগ্ম-হস্ত তুলে সাড়া জানালেন আর সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন আনন্দের এক সত্যকার প্রবল প্রবাহ—আমার অন্তরের অন্তস্থলে।

বিদায় নিতে গিয়ে আমি সাধারণতঃ অসুস্থ বোধ করি। আজকের এই বিদায় ও আমাকে স্বতঃই শত-ছিন্ন করে ফেলত। কিন্তু ক্ষণিকের বেদনা ও জাগেনি। মাতাজীর এই সাড়া দেওয়াটি যেন কালাতীত এক ঘটনা। আমি আমার সত্বার পরতে পরতে অনুভব করছিলাম। ক্ষণস্থায়িত্বের দ্বারা বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই যেন।

এর পরের কয়েক সপ্তাহ আমি এমন এক নৈশ্চিন্ত্য, এমন এক নিঃসংশয় সুখ পেয়েছিলাম—যা জীবনে আর কখনো পাইনি;—যদিও

আমি একাকিনী সামান্য কপর্দক নিয়ে ইউরোপ-বহির্ভূত দেশে ভ্রমণ করেছিলাম এই সর্ব্বপ্রথম।

মাতাজীর কাছে আমি যে কত ঋণী—আমার কাছে সেটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো কিউবান দুর্গতির সময়। আর সবার মত আমিও দেখেছি—কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতি! তবে এমন পরিস্থিতিতে আমার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত পূর্বে—সেটি কিন্তু হলনা—আমার মধ্যে ভয় স্থান পেলনা। সম্ভবতঃ এটি বুঝেছি আমি—শুধু মন দিয়ে নয়, বুঝেছি আমার সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে—যত নিষ্ঠুর রূপই নিক বাহ্যিক ধ্বংস-কাণ্ড, আমাদের প্রকৃত সত্ত্বাকে সে স্পর্শও করতে পারে না। আহা! যেন এই জ্ঞানকে আমি ধরে রাখতে পারি চিরকাল।

জৈন বৌদ্ধদের একটি প্রবচন আছে ঃ "জ্ঞানী যদি শুষ্ক শাখাকেও স্পর্শ করে, সেই শাখাতেও ফুল ফোটে।"

একজন ইউরোপীয়র দৈনিক নামচা

(লেখিকা—মেলিটা ম্যাসম্যান)

জার্মান ভাষা হইতে তর্জ্জনা

ভূমিকা

(ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে জার্মানী হইতে কয়েকজন এসেছিলেন ১৯৬৩ সনের অক্টোবর মাসে। তারা সকলে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক Melita Maschmann (সাহিত্যে Noble Prize বিজয়ীনি) দেশে ফিরে এটা লিখেছেন। অপূর্ব্ব লেখনী। ভাষায় প্রকাশ করা—বাংলায় এর তর্জ্জমা করা বড়ই দুরূহ। প্রথমে ইংরেজীতে তর্জ্জনা করে ইংরেজী আনন্দ বার্তায়—August 1965, Vol-XIII, No-2-তে প্রকাশিত হয়েছিল।)

বিন্ধ্যাচল

অক্টোবর—১৯৬৩

আজ অপরাহ্নে মাতাজীর ঘরের সামনের বারান্দায় প্রায় এক ঘন্টার মত সময় আমি বসেছিলাম। যখন তিনি বের হয়ে এলেন—তাকে বৃদ্ধা ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। (সম্ভবত তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন)। তার শরীরে উজ্জ্বলতা নেই, ফ্যাকাসে—চোখ দুটি প্রাণহীন এবং মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই।*

পাঁচ মিনিটের কম সময়ের পর তিনি তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন—সোজা হয়ে, হাঁসি মুখে উজ্জ্বলতার আভা নিয়ে যেন আলোর

---

* ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মের শেষে লেখিকা প্রথম ভারত পরিদর্শনে এসে কনখলে মা আনন্দময়ীর দর্শন পান। সেটা ইংরেজী আনন্দ বার্তা Vol XI এ প্রকাশিত।

একটি খনি—বিচ্ছুরিত হচ্ছে আনন্দের ধারা। কি পরিবর্তন! কি বিস্ময়! হতে পারে রক্তমাংসের শরীরে বার্দ্ধক্যতা ও শীর্ণতা এসে গেছে, কিন্তু আত্মা তা সরিয়ে রেখে চিরযৌবন এনেছে।

সাধারণতঃ যা হয়, মাতাজি কিছুক্ষণ আমাদের মাঝেই এদিক ওদিক পায়চারি করলেন। তিনি কেমন করে হাঁটাচলা করলেন—আমার ইচ্ছা থাকলেও তা বর্ণনা করতে পারব না—করলেও সঠিক হবে না—তিনি কেমন গভীর শান্তভাবে মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপ করছিলেন। আমি বলব রাজকীয় ভাবে দৃঢ়তাপূর্ণ পদক্ষেপ। সেই সাথে মনে হবে—যে শক্তি তিনি দেখাচ্ছিলেন তা যথার্থই মর্যাদাপূর্ণ—কোনরূপে অতিদৃঢ়তা নয়। বরং মসৃণ ও প্রেমময়। কে সেকথা বুঝতে পারবে? আমি কেবল বর্ণনা করছি যা আমি বুঝেছি। কিন্তু সত্যি সত্যি তাই কি দৃশ্য ছিল? এর চেয়েও অনেক অনেক বেশি কঠিন তা উপলব্ধি করতে। মাতাজীর হাঁটার সময় সময় মনে হচ্ছিল মাতাজীর সাথে কোন অদৃশ্য সঙ্গী আছেন। আমি জানি আমি এ কি বলছি এবং তাও আবার বলছি ইউরোপীয়নদের কাছে—মনে হবে কি আজেবাজে এ সব কথা।

আরো আছে লক্ষ্য করার বিষয় যে—তা বুঝতে হবে আমাদেরই অন্তদৃষ্টি দিয়ে যা আমাদের সাধারণ চোখের পেছনে থাকে। এই অন্তদৃষ্টি মাতাজির সাথে সাথেই দুদিকের কাঁধের কাছে এটা খুবই পরিস্ফুটিত—কিন্তু তাই বলে কি বলা যায় যে ওখানে সেই অবস্থান?

এই অদৃশ্যতাবাদের সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। (আমার নিজের সন্দেহ এমন কিছু নেই)। তবু বলছি এখানে আমরা পুরো একটা দলই উপস্থিত।

আশ্রমের আবাসিকা 'চিত্রাদি' বললেন এই সবই সত্যি—আমি জানি। মাতাজিকে জানতে চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই। পুরো দলকেই তিনি অনুরোধ করলেন।

এরপর মাতাজী আবার 'একাকী' হলেন। বারান্দায় একটা নীচু কাঠের চৌকীতে বসলেন—তার নিজের ঘরের খোলা দরজার দিকে মুখ করে। মাতাজীর সাথে কথা বলতে স্থানীয় তিনজন বৃদ্ধ অপেক্ষা করছিলেন। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বৃদ্ধ—তিনি দৃষ্টিহীন অন্ধ। আমরা

সকলে মাতাজীর ডাইনে-বায়ে বসেছি। আমি সম্ভবতঃ মিটার চারেক দূরে—মাতাজী এবং আমার মাঝে ফাঁক।

মাতাজী ধ্যানের ভাব ধারণ করলেন। আমি কেবল তার অবয় দেখতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল তিনি স্থির হয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ সময় তিনি একেবারে স্থির হয়ে রইলেন। হঠাৎ তিনি তার মাথা আমার দিকে ঘুরালেন। তার দৃষ্টি আমার উপর পড়ল—সার্চ লাইটের আলোক রশ্মীর মত। যে ভদ্রলোক ঠিক আমার পেছনে কোনাকোনি হয়ে বসেছিলেন, পরে তিনি আমায় বলেছিলেন যে "তিনি তখন তার ঘড়ি দেখছিলেন—কারণ মাতাজীর দৃষ্টিক্ষণ যেন ফুরাচ্ছিলই না—সম্ভবতঃ মাতাজী ৪/৫ মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

এখানে যা হয়েছিল, তা আমার পক্ষে কোন সময়ের মধ্যে নয়, এটা ছোটবেলা হতেই আমার একটা অনুভূতি—যা আমি মাঝে মাঝেই আস্বাদন করি—সময়ের অনন্যতা অসীমতা।

মাতাজীর চোখের কোন পলক না নড়ে তার দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ রইল। মনে হল ঐ দৃষ্টি একটা উজ্জ্বলতা নিয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করছে—যেন অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বিরাট সূর্য্য। এর বৈশিষ্ট্যতা আমাকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার ভেতরের সব দরজা কেমন আপনা আপনি খুলে গেল। মনে হল একটা গভীর শক্তিশালী নির্মল আলো আমার ভেতর প্রবেশ করল।

যখন আমি এই আলো পাচ্ছিলাম—তখন আমার মন খুবই সূক্ষ্মতার সাথে তা অনুধাবন করছিল।

হঠাৎ মাতাজি তার দৃষ্টি আমার উপর হতে সরিয়ে নিলেন এবং সাথে সাথেই সামনের একজন মেয়েকে ঠাট্টা করলেন। মেয়েটি তখন খুবই একাগ্রতা নিয়ে একটা হ্যান্ডব্যাগ বুনছিল। আমি বারবারই লক্ষ্য করেছি যে এই আধ্যাত্মিক বিচ্যুতি সাধারণ জায়গায় খুব ক্ষণিক—মুহূর্তের মধ্যে তা মাতাজী হইতে বের হয়ে আসে। তোমাকে খুবই শতর্ক থাকতে হবে যে তুমি যেন তা হারিয়ে না ফেল। যেমন মনে কর হঠাৎ এক জনতার ভেতর তোমার চেনা কোন মুখ ভেসে উঠল—তা মুহূর্তের মধ্যে আবার

অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয় সত্যিই কি ছিল না স্বপ্ন দেখছিলাম?

আমি বিশ্বাস করি—আমি ভাবতে পারি এই মুহূর্তগুলি কেন এত ক্ষণিক। আমাদের জন্য এইসব স্বচ্ছ মুহূর্ত হৃদয়েও স্পর্শ খুবই কম আসে যা অমূল্য। মনে হয় মরুভূমিতে বালুর মধ্যে হঠাৎ মুক্তার দেখা পাওয়া। এমন কোন ঘটনাই কেহ কোনদিন ভুলতে পারে। মাতাজী আধ্যাত্মিকতার আলোতে বিরাজিত। এটা সত্যি যে তিনি যে আমাদের মধ্যেই আছেন। তবু মনে হয় তিনি এই দুই জগতের মধ্যে থাকেন না—থাকেন আলাদা কোন এক জগতে।

আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে—'আজ বিকেলে মাতাজীর এই অতিমানবিক অন্তর্দৃষ্টি। এতক্ষণ সময় ধরে কখনও কোন মানুষ আমাদের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকায়? সম্ভবতঃ প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যে এমন দৃষ্টি হতেই পারে—যখন তারা ভাষার শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তখনই তারা তাদের একান্ত ভাব প্রকাশ করে। মাতাজীর দৃষ্‌টি এখানে ঠিক এর বিপরীত ছিল। সেই দৃষ্টি আমার নিকট নিয়ে এলো—তার মানবিক হৃদয়ের বার্তা নয়— নিয়ে এখানে মানবিক হৃদয় কেবল বয়ে আনার ভাব প্রকাশ করল। মনে হয় একটা ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন—যার জন্য আমাদের ধারণ-যন্ত্র সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

অবশ্য এই প্রক্রিয়া খুবই দুরূহ। ঐ ঈশ্বরিক শক্তি টেনে এনে সবাইকে দেওয়া চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—মাতাজীর ভালবাসার এক বিরাট অবদান। যেন তার সমস্ত জীবনের একত্র প্রতিক্রিয়া। মাতাজী যে 'আলো' পান—সেটাই তিনি আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন, আমাদের দেখার শক্তির মধ্যে। আমাদের আলোকিত করাই তার ইচ্ছা—তার জীবনের উদ্দেশ্য।

মোটামুটি বলতে এই ছিল আমার মানসিক ভাব যখন মাতাজী আজ আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। সমস্ত যদি মানবিক ভাব-গুণ যা মাতাজী আমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন স্নেহ-ভালোবাসার একটা দান

হিসাবে। মাতাজীর ভক্ত শিষ্যা একজন মেয়ে ঐরূপ ঘটনাকে আমার মাতাজীই বলেছেন—ভগবান আমাকে এক ডালা পরিপূর্ণ চাল দিয়েছেন। যা দিয়ে আমি তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছি। গ্রহণ কর যাতে তোমরা সবল হতে পার।

এক বিষয়ে একটা সঠিক যে ঐ ভাবেই 'দেওয়াটা' গ্রহণ করা যায়।

মাতাজীর মধ্যে যে 'দুটি সত্ত্বা' বিরাজমান কে না তার অভিজ্ঞতায় বার বার উপলব্ধি করেছে। হিন্দু লোকেরা বলেন—'আমি' এবং 'স্বয়ং'। এই সব যুক্তিবাদ ভয়াবহ কারণ এটা ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে যখন এই মতবাদ সাধারণভাবে গ্রহণ যোগ্য নয়। সর্বপরি এটা আমি মানি দৃঢ়তার সাথে নয়—মোটামুটি ভাবে। আমার প্রতি যখন মাতাজী তার দৃষ্টি দিয়েছিলেন—তখন তিনি ছিলেন 'স্বয়ং' এর আধার। আমার এই "স্বয়ং" তার খুবই নিকটবর্তী—আমার "আমিত্ব" হতে। এটা মেনে নেওয়া যায় নিজস্ব মতবাদে—আবার নিজস্ব নয় ভেবে।

এরপর 'মাতাজী' উঠে পড়লেন পর আমি তাকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে প্রণাম জানিয়ে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি মোটামুটি ভাবে এটাকে এড়িয়ে গেলেন। যে ধন্যবাদ জানায় সে তো এই পৃথিবীর দুইর মাঝে থাকেন—যেখানে দেওয়া নেওয়া আছে। যে তার নিজের মধ্যেই থাকেন তার কাছে এর ব্যবধান তো অর্থহীন। যখন আমি তার দিকে তাকালাম—মনে হল তার দৃষ্টিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে— কেহ কি নিজকে ধন্যবাদ জানায়।

কয়েকবার ঐ বারান্দায় পায়চারি করে মাতাজী তার ঘরের সামনের নীচু একটা জলচৌকিতে বসলেন। সেই তিনজন লোক তার কথা শুনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন মাতাজী বেশ সুন্দর দৃপ্ত ভাবে কথা শুরু করলেন। মাতাজীর (বাংলা হিন্দী মেশান) কথা আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাই মাঝে তার কথার বিরতির মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম মাতাজী কি বললেন। মাতাজী সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, তুমি তোমার জীবন কি ভাবে কাটালে?' তিনি আরো বললেন 'আমাদের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যদি ভগবানকে স্মরণ না

করি তাহলে জীবনই বৃথা। মনুষ্য শরীরে জন্মগ্রহণ করাটাই বিরল ঘটনা। তোমার জন্ম যদি পশু শরীরে বা পক্ষীতে হোত—তোমার জীবনের কি মূল্য বা সার্থকতা থাকত? কেবল মাত্র মনুষ্য শরীরেরই ক্ষমতা আছে ভগবানকে খোঁজ করা ও খুঁজে পাওয়া।

মাতাজী তার চারিদিকে যারা ছিলেন—তাদের সবাইকে বললেন—'তোমরা তোমাদের নিজকেই জিজ্ঞাসা কর, কি করে তোমরা সময় কাটাচ্ছ। আমরা এত সহজে ভুলে যাই যে সামান্য যে সময়টুকু চলে গেল তা আর ফিরবে না। তোমার দৃষ্টির বাইরে অগোচরে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন দেখবে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ এবং লাগাতার কিছু করার ক্ষমতায় পরিশ্রান্ত! ভগবানকে পেতে বা জানতে হলে তোমার বৃদ্ধ বয়সা ঠিক নয়—যখন তোমার আর কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। তাকে পেতে বা দেখতে হলে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলতা প্রয়োজন। যে এখনও তা শুরু করোনি, আজই তা করবে, এখন থেকেই—এই মুহূর্ত্ত হতেই।

এরপর মাতাজীর দৃষ্টি ধীরে ধীরে একজন থেকে অন্যজনের প্রতি চলমান হল। হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন এবং তার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় আমাদের সকলকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। সেই যে তিনজন বৃদ্ধ এসেছিল তাদের মধ্যে যে বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি কিছু যোগ প্রক্রিয়া দেখাতে চাইলেন যাহা নাকি জীবন আয়ু দীর্ঘতর করে। তিনি বল্লেন—তার গুরুদেব নাকি ১১৮ বৎসর অবধি বেঁচেছিলেন।

মনে হল লোকটি কিছুটা আত্মভারী এবং সঙ্কীর্ণমনা। প্রত্যেকেরই মনে হল তিনি কিছু আজেবাজে কাজ করবেন কিন্তু কেহই তাকে বাধা দিতে চাইলেন না। মাতাজী তা সহ্য করবেন না। লোকটি বেশ কৌশলতার সাথে কিছু শারীরিক ব্যয়াম দেখালেন। এসবে নতুনত্ব কিছু নেই—কেবল তার পুরোপুরি শরীর দৃঢ় হয়ে যাওয়া ছাড়া। মাতাজী খুবই আগ্রহ নিয়ে বন্ধুভরে সব দেখলেন—কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন এবং তাকে শুধরিয়েও দিলেন। লোকটা পুলোকিত হল।

এই ঘটনা থেকে আমার মনে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মাতাজী আমাদের সাথে ধৈর্য্যের পরীক্ষা করলেন না তো? আমাদের দম্ভিবতা দমিয়ে রাখার জন্য অনেক সময় আমরা ধৈর্য্য ধারণ করি। এখানে ঐ লোকটির কার্য্যকলাপ দেখে আমাকে ধৈর্য্য রাখতে হয়েছিল। লোকটি আমাকে অসহ্য করল আর সাতে সাথে বিরক্তও করল। যেখানে আমি আমিত্বতে নেই—সেখানে এমন কিছু বিষয় নেই—যা নাকি একঘেয়েমি এবং বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

মাতাজীর বন্ধুত্বতা রূপ অন্যরকম—আমাদের সাথে তার কোন মিল নেই—যদি বা আমাদের কোন উৎসাহ এবং সহমর্মিতা তার প্রতি থাকত। উদাহরণ স্বরূপ বলছি আমি আমাকেই বলতাম—তুমি কি ঐ লোকটাকে খুবই আগ্রহ সহকারে নিবে। যা হোক লোকটি তো এসেছে কিছু দেখাতে যা সে মনে করে অন্যের উপকারে আসবে। অন্যে যে যা ভাবুন। লোকটি তো প্রশংসা চায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। মাতাজীর কাছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। বন্ধুত্বতা তার কাছে একটা সামাজিক বিষয় নয়—যার জন্য তার চেষ্টা করতে হবে। মাতাজী বন্ধুত্বপূর্ণ। একথা সাধারণ ভাবে বুঝতে হবে যে, যেমন কিছু পাঠক প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলবে মাতাজী ভারতীয়। প্রত্যেক মানুষের তিনি বন্ধু যারা তার সাথে দেখা করতে আসেন। এটা কোন বিনম্র কথা নয়—একেবারে সঠিক ব্যাখ্যা।

একজন চিকিৎসকের মত (যদি তিনি সত্যি সত্যি চিকিৎসক হন যেটা তার হওয়া উচিত) যিনি তার রুগীদের মধ্যে ধনী না গরীব দেখেন না, রুগী বুদ্ধিমান না বুদ্ধিহীন, রুগী দেখতে সুন্দর না কুৎসিত, ভালো লোক না মন্দ লোক দেখেন না, কিন্তু কেবল দেখেন সে অসুস্থ পুরুষ বা মেয়েলোক। যাকে তার সুস্থ করতে হবে। ঠিক সেই ভাবেই মাতাজী সকল লোককেই তার বন্ধু হিসেবে দেখেন। এবং মাতাজী সেই ভাবেই সকলের সাথে দেখা করেন—"বন্ধুত্বপূর্ণভাব।" সম্ভবতঃ এটাই মাতাজীর প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণের রহস্য। তাকে কখনই বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে করতে হয় না। তার চেষ্টা বৃথা যাবে যদি কোন অবন্ধুত্বতার ভাব দেখাতে চান।

রায়পুর আশ্রমে (দেরাদুন) আমি এ রকম মাতাজীর একটা প্রয়াস দেখেছিলাম। ঐ আশ্রমের আবাসিক একজন মেয়ে—একরকম একটা কিছু কাজ করত যেটা অন্যেরা পছন্দ করত না—ভুল মনে করত। (আমার মনে হয় সেটা ছিল খুবই বেশী বেশী শুচিতার বিচার করা) তখন অন্য মেয়েরা মাতাজীকে অনুরোধ জানাল—'মা একে খুব করে বকে দাও তো! মেয়েটা আমাদের কথা মোটেই শুনে না। মা দয়া করে একে বকে দিন।

মাতাজী সেই মেয়েটাকে ডেকে পাঠালেন। মাতাজীর মুখের ভাব বদলাচ্ছিল—সেই সাথে কৌতূক মেশান। চেষ্টা করছিলেন মুখের কঠিনভাব থেকে কঠিনতর ভাব করা—দৃষ্টি করা। কিন্তু সেই রাগের মুখশ ছিল স্বচ্ছ ও ভাসা ভাসা। মুখের কথাও তেমন লুকোচুরি করছিল—অবন্ধুত্বতার ভাব নিয়ে—মুখোশ নিয়ে। হঠাৎ মাতাজীর পরিবর্তন হল এবং প্রাণখুলে হাঁসতে লাগলেন। হাঁসতে হাঁসতে মাতাজী মেয়েটার কাছে উঠে দাঁড়ালেন—নিজেই একটা ছোট মেয়ের মত এবং বললেন, তুমি কি জানো না যে আমি কারো প্রতি রাগ করতে পারি? তা হলে তোমাকে আমি কি করে বকতে পারি?

লাবণ্যময়ী ও আকর্ষণীয় কথার উৎপত্তি একই। মাতাজীর দিকে তাকালে একজন সোজাসুজি তা বুঝতে পারবেন। তার লাবণ্য হল আধ্যাত্মিক ধরনের। সে কথাই সত্যি তার অমোঘ বন্ধুত্বপূর্ণতার আকর্ষণের জন্য। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে সেটা একজন তার আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান দিয়ে সঠিক বুঝতেই পারে যে ব্রাহ্মণত্বই এর পেছনে বিরাজমান যা থেকে এই নিজজ্ঞান—স্ববিদ্যা। তার বন্ধুত্বপূর্ণ এই প্রকাশ প্রেমেরই অভিব্যক্তি যা পরমেশ্বর স্বয়ং ভালোবাসেন।

বিদেশীয় লোকেরাও শ্রীশ্রীমাকে যে কি প্রকার ভালবাসেন তার একটি ঘটনা এখানে আনন্দবার্ত্তার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য দিচ্ছি। বাঙলা ১৩৬৪ সনের (১৯৫৭ খৃঃ) গুরুপূর্ণিমার পর মা যখন দেরাদুন থেকে কাশী আসেন, সেই সময় মার্কিন দেশীয় একজন প্রৌঢ় সাহেব ও একজন মেম, (সম্ভবতঃ তাঁহারা পতি-পত্নীই হবেন) মাকে দর্শন করবার মানসে দুপুরবেলা আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মা তখন ভোগের পর তাঁহার ছোট্ট ঘরটিতে বিশ্রাম করছিলেন। সে সময় সাধারণের মার সঙ্গে দেখা করবার সময় নয়। যখনকার ঘটনা তখন মার সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ করবার নির্দিষ্ট সময় ছিল বিকেল পাঁচটার পর। মায়ের দর্শনের সময় ঐ সাহেব ও মেমকে জানান হয়। তাঁরা উভয়ে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে স্বীকার, তথাপি মাকে দর্শন না করে তাঁরা যাবেন না। তাঁরা মাকে দর্শন করে ঐদিনই কাশী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন।

আশ্রমবাসী কে যেন মাকে সংবাদ দিলেন। তাঁরা বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী তবুও মার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। এই কথা শুনেই মা তাঁদের বিশ্রামের স্থানেই নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি দিয়ে নিজে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। আগন্তুকেরা মনেও ভাবেননি যে এই অসময়ে মার দর্শন পাওয়া সম্ভব হবে। আশ্রমবাসী কে একজন গিয়ে তাঁদের খবর দিলেন যে এখুনি মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সংবাদ পেয়ে তাঁরা পরম আনন্দে হাসতে হাসতে মায়ের শয়ন কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। মা তাঁর বিছানার ওপর স্থিরভাবে বসেছিলেন। একজন দোভাষীর (Interpreter) মাধ্যমে মায়ের কথা তাঁদের এবং তাঁদের কথা মাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। মা কথার কথায় নিজের শরীরটিকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "your baby" অর্থাৎ "তোমাদের ছোট্ট বাচ্চা" এখানে বলা বোধ হয় খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মা আজকাল মাঝে মাঝেই দু'চারটে ইংরেজী শব্দ বলে থাকেন। বলা বাহুল্য শব্দগুলি যথাস্থানে প্রয়োগ ও ঠিক্ ঠিক্ উচ্চারণ করতে দেখে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে মা ইংরেজী ভাষা আদৌ জানেন না।

শ্রীশ্রীমার মুখ থেকে এই শব্দ দুটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেমটি মার কাছে গিয়ে মাকে ধরে খুব আদর করতে লাগলেন। মাতৃস্নেহে মেমটি হয়ে উঠলেন যেন একেবারে আত্মহারা—বাৎসল্যরসে তাঁহার হৃদয় হয়ে গেল প্লাবিত। বহুবছর পরে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে পেয়ে যেমন গর্ভধারিণী যার বাৎসল্য প্রেম উথলে ওঠে, তেমনি তাঁর ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো মাকে পেয়ে। মেমটি কি করে যে তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালবাসা প্রকাশ করবেন তা যেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। সাহেবটি স্থিরভাবে বসে বসে দেখছিলেন তাঁর পত্নীর আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যক্তি। তিনি ও আর তাঁর নিজের অন্তরের গভীর প্রেম চাপতে না পেরে মায়ের কাছে গিয়ে মার মাথাটি নিজের কাঁধের ওপর রেখে এমন দরদ দিয়ে আদর করতে লাগলেন যেন সত্য সত্যই তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে অনেক দিন পর ফিরে পেয়েছেন। এই ব্যবহারে কোথায়ও ছিল না এক ফোঁটা কৃত্রিমতা বা লোভ দেখান ভাব—উহা ছিলো একেবারে বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেম। তাইতো বলে যে কোন জ্ঞান যে কোন ভালবাসা পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে ভগবৎ-জ্ঞানে ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়। এই পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে অতি দুর্লভ। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে নীরবে বসে দেখতে লাগলেন অনিমেষ নয়নে মাকে—মাকে দেখে যেন তাঁদের আশা মিটছিলো না—মাকে কেবল তাঁরা দেখছেন আর দেখছেনই। মাকে দেখতে দেখতে যেন তাঁরা একেবারে সমাহিত হয়ে পড়লেন। কিছু সময় এইভাবে থেকে যখন তাঁরা আবার ফিরে এলেন আমাদের এই জগতে—তখন তাঁদের মুখে ভেসে উঠলো এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমা।

মার কাছ থেকে ঐ মার্কিন দম্পতি বিদায় নেবার সময় তাঁদের উভয়ের চোখের কোণে দেখা গেলো বাৎসল্য-প্রেমের অতি পবিত্র অশ্রুকণা। শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে যেতে যেন মন আর তাঁদের চায় না। তাঁরা যাবার সময় এক এক পা যান আবার মায়ের মুখের পানে ফিরে ফিরে চান আর রুমাল দিয়ে মোছেন তাঁদের সজল নেত্র—যেন কোন পরম আত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন চিরতরে কোন এক অতি দূর দেশে। সেই বিদায়ের মর্মান্তিক দৃশ্যটি আজো আমার চোখের

সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে রয়েছে। তাঁরা দুজনে চলে যাবার পর মা তাঁদের আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যক্তি দেখে বলে উঠলেন, "আজ এই সাহেব যেমন আদর করলো, এই শরীরের বাবাও কোন দিন এমন ভাবে এই শরীরটাকে আদর করেন নাই।"

* * *

কেবল যে স্থূল শরীরধারী মানুষ ও পশু প্রভৃতিই মার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসছে তা নয়, কত অশরীরী বা সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মাও মায়ের প্রতি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। গত ১৯৫৭ সনে গরমের সময় মা যখন দেরাদুনে ছিলেন তখন মার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। সেই খবর পেয়ে কাশী থেকে মার একনিষ্ঠ ভক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়, সোলন থেকে মাতৃগত প্রাণ বাঘাটনরেশ শ্রীদুর্গা সিংজী, বৃন্দাবন থেকে শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূত মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই সেই সময় মাকে দেখতে দেরাদুনে ছুটে গিয়েছিলেন। মায়ের অবস্থা দেখে আমরা তো বিশেষ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম মার জন্য। সেই সময় একদিন রাতে, যেদিন মায়ের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিলো—মায়ের প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ যোগিবর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজ এবং আরো কয়েকজন উচ্চ কোটির মহাত্মারা সূক্ষ্ম শরীরে মায়ের কাছে এসেছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মহারাজ মায়ের সম্মুখে একেবারে মাটিতেই বসে পড়েছিলেন। বাকী কয়জন মহাত্মা মাকে প্রদক্ষিণ করে যে তাঁকে কি প্রার্থনা জানালেন তা কেবল মাই জানেন।

* * *

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময় একদিন মা আশ্রমের খোলা মাঠে পায়চারি করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে হরিকুঞ্জ, কৃষ্ণকুঞ্জ ও রামকুঞ্জের দিকে মা এসে পড়লেন। সেই সময় মাকে একান্তে পেয়ে আমাদের দেখা হয়। জ্যোতিষদাদার দেহত্যাগের পরদিন মার যখন সমাধি অবস্থা হয় তখন সেই মহিলাটি আসিয়াছিলেন এবং বহুক্ষণ চোখ বুজিয়া মার কাছে বসিয়া ছিলেন। তিনি স্পেনদেশীয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আমি শুনিলাম তিনি

ফরাসী। একজন ইংরাজের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইনি পতিকে ভারতবর্ষে নিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ওঁর স্বামী এখানে থাকিতে পারিলেন না বলিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন, আর ইনি এখানেই আছেন; সাধু সন্ন্যাসীর সহিত খুব দেখা করেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দ ও দাক্ষিণাত্যের রমণমহর্ষি—সকলের সহিতই দেখা করিয়াছেন।

এই ফরাসী মহিলাটি মার সহিত দেখা করিতে দেরাদুন গিয়া হরিরামের সহিত দেখা করেন। মা তৎপূর্ব্বেই দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার নাম 'পেন্টরোজ' (Pentrose)। ইনি হরিরামকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, "আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি কিন্তু মার মত এমন পূর্ণ ভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমি যখন আলমোড়াতে মার সমাধি অবস্থায় মার কাছে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম মার শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম, হয়ত আমার দেখিবার ভুল হইতেছে, এই ভাবিয়া চক্ষু খুলিয়াও দেখি সেইরূপ। কিছুকাল পরে মার শরীর হইতে একটা সূর্য্য কিরণের মত জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহা শান্ত হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পরে মা আমার দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম এবং তখন আমি শান্ত হইলাম। অনেক লোকের ভিড় ছিল। এর পরে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি মনে করি মাই 'পরাজ্ঞান'। আমি নিজের ভিতকে দুর্গা কালী তারা প্রভৃতি দেখিয়াছি এবং আমি তারার উপাসক। আমার মনে হয় মাই তারা। তিনি আমাকে যে আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।"

হরিরাম তাঁহাকে দেরাদুনের 'মৌনঘরে' বসিতে দিয়াছিল। তখনও নাকি তাঁহার খুব সুন্দর এক অনুভূতি হয়। তিনি বলিয়াছেন, "মাকে দেখানেও দেখিলাম বিরাট মূর্ত্তিতে হাত পাতিয়া বসিয়া সকলকে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, 'তোরা বাহিরে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস? আমার ভিতর আয়, অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর্।"

ইনি যখন হরিরামের কাছে শুনিলেন, কমলা নেহেরু মার কাছে আসিতেন ও মাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, তখন ইনি বলিলেন, "আমার এক ফরাসী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি তিনি কমলা নেহেরুর বন্ধু ছিলেন। কমলা

নেহেরু বিলাতে আমার বন্ধুটিকে বলিতেন, এক মাতাজীকে তিনি সর্ব্বদা চোখের সামনে দেখিতে পান। নেহেরু বন্ধুটিকে এই মাতাজীর কথা অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং তিনি আমাকে আসিয়া সব কথা বলিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, কে এই মাতাজী? একবার দর্শন পাইলে হইত, এখন বুঝিতেছি আনন্দময়ী মাই সেই মাতাজী। আমি আমার ফরাসী বন্ধুকে একথা লিখিয়া দিব।"

ইনি হরিরামের মারফৎ মাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতেও মার প্রতি তার কি সুন্দর ভাব, কত ধারণা—তাহা প্রকাশ পায়। ইনি মার সঙ্গে কিছুদিন থাকিতে চান এবং আশ্রমে থাকিয়া মার আদেশমত কাজ করিতে রাজি আছেন। লিখিয়াছেন, মা সমুদ্রের ধারে অথবা পাহাড়ের উপরে—যেখানেই থাকিতে চান, ইনি বন্দোবস্ত করিতে রাজি আছেন—ইত্যাদি।



Published By : Gopa Ghose, 46, Satish Mukherjee Road, Kolkata - 700 026
Printed By : Satyen Jha, Rahul Printer, 83/1A S. M. Road, Kolkata - 700 026